শ্রীকান্তের কমললতা

বিশ্বনাথ চৌধুরী

দেজ বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক—
অখিল ভারত জনশিক্ষা প্রচার সমিতির পক্ষে
পি, যোষেফ ও সুভাষ গুপ্ত
৫৯, পাম এভিন্যু 'বি' ব্লক
কলিকাতা-১৯

মুদ্রক—
পাণ্ডুলিপি
২১/এ, পার্ক সাইড রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬

আমার নিবেদন

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র একটি বিদ্রোহী সাহিত্যিক। বিশ্বসাহিত্যেও বটে। তাঁর শ্রীকান্ত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব এ-যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি। এবং শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বের নায়িকা কমললতা এক মহাবিস্ময়। এই কমললতাকে কেন্দ্র করে শরৎ-সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করেছি—চেষ্টা করেছি শরৎ-দর্শনের। এই গ্রন্থখানি লিখতে প্রেরণা দিয়েছেন রঞ্জিত গুপ্ত আই, জি। তাঁর প্রেরণা ও জননী কমলাদেবীর উৎসাহ না থাকলে এ-লেখা লেখা হ'তো না। যদি এই গ্রন্থ পাঠ করে কারুর আনন্দ হয় তাহ'লে নিজেকে ইর্ষাই করবো।

বিশ্বনাথ চৌধুরী

২৫শে ডিসেম্বর ১৯৫৭
স্ুরভিস্থান
নদীয়া

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য নিয়েছি

১। শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ ২। রবীন্দ্র রচনাবলী ৩। শ্রী-চৈতন্যচরিতামৃত ৪। শ্রীমদ্ভাগবত ৫। শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫। শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র-মোহিত লাল মজুমদার ৭। শরৎচন্দ্র ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত ৮। শরৎচন্দ্র ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড গোপাল রায় ৯। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস-শঙ্করীপ্রসাদ বসু। ১০। পদাবলী পরিচয়—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১১। বাংলা উপন্যাসের ধারা ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১২। শরৎচন্দ্র—কানাইলাল ঘোষ ১৩। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী ১৪। শরৎচন্দ্রিকা ১৫। রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ—প্রমথ নাথ বিশী ১৬। সাহিত্য দর্পন ১৭। উজ্জ্বল নীলমণি ১৮। বাংলার বাউল—ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ১৯। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর ২০। নিষিদ্ধ দেশ আর নিষিদ্ধ কথা—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২১। কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২২। বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ—বিনয় ঘোষ ২৩। সুখের সন্ধানে—বারট্রাণ্ড রাসেল ২৪। ভারতের শক্তি সাধনা ও শক্তি সাহিত্য—ডঃ শশীভূষণ দাসগুপ্ত ২৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ২৭। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা—শ্রীসতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় ২৮। উপনিষদ গ্রন্থাবলী উদ্বোধন ২৯। শরৎচন্দ্র-জীবন ও সাহিত্য ৩০। Complete works of G.B.S ৩১। The English Novel—Walter Allen. ৩২। The Metaphysical Poets. ৩৩। The pleasures of philosophy. ৩৪। Buddhism C. Humphreys. ৩৫। Tree of life—Halevi. ৩৬। The complete Greek Drama.— ৩৭। Buddhism

৩৮। The Sufi orders in Islam. ৩৯। Sufism. ৪০। The poems of Hafiz. ৪১। A concise cambridge History of English Literature.—Churchill Sampson. ৪২। The Holy Bible. ৪৩। The complete works of Gvy De Maupassnt. ৪৪। The comparetive Literature. ৪৫। Selected literary criticism—D. H. Lawrence. ৪৬। Ten Novels and ten Authors—Somerset Mangham.

ভূমিকা

১

বিংশ শতাব্দীতে দু'টি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে। ভবঘুরে ছন্নছাড়া জীবন বেছে নেয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঔপন্যাসিক হিসেবে বাংলা সাহিত্য মঞ্চে আত্মপ্রকাশ। দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নাগাসাকি ও হিরোসিমায় আনবিক বোমা ফাটানো। এই ভীষণ ধ্বংসাত্মক বোমার ঘটনা শরৎচন্দ্র দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু তিনি স্বয়ং বাংলা উপন্যাস সাহিত্য ক্ষেত্রে যে বোমা ফাটালেন তাতে বাংলা উপন্যাসের গতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভাবে পাল্টে গেল। সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের প্রবেশ অতর্কিত ভাবে—যেন গাণ্ডীব ধারণ করে। এ-কালের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করলে মনে হয়—কক্ষচ্যুত কোন গ্রহ উল্কা গতিতে ধেয়ে এসে অন্য একটি গ্রহকে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা মারলো। সেই গ্রহটি বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং তিনি তাঁর চোখের বালির ভেতর দিয়ে যে দ্যুতি ও মধ্যাকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করেছিলেন তা অনেকখানি ম্লান হয়ে গেল শরৎচন্দ্রের আগমণে। এর ইতিহাস দুঃখ ও আনন্দ দুটোই বহন করে এনেছে। বিশ্ব-কবির সাহিত্য-পরিধি ভূধর বিশাল। সেখানে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য গোষ্পদ সমান। তবু গোষ্পদে যে একটা নতুন আকাশ তিনি দেখালেন—তা বাংলা সাহিত্যে কেন—বিশ্বসাহিত্যের বাছা বাছা রথী মহারথীরা পারেন নি। আমরা জানি সাহিত্যিক হলেন শিল্পী—আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সন্ধ্যার মেঘ ফুটিয়ে তোলেন লেখনী নামক তুলিকায়। এবং শরৎচন্দ্রের লেখনী এক্ষেত্রে তুলিকা নয়—এক ইলেকট্রনিক ক্যামেরা বিশেষ। কল্পনার ইন্দ্র ধনু

ছটার রক্তিম আভা নেই—আছে প্রকৃত রামধনুকের সাবলীল ফোটো। এখানে শরৎচন্দ্র সুদক্ষ ফোটোগ্রাফার মাত্র। প্রলাপ বা বাচালতার বাহুল্য নেই। আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংলাপের তীক্ষ্ণ শরবৃষ্টি। যা জীবন ও সমাজকে তির্যক ভাবে প্রতিফলিত করেছে। যে চেষ্টা চেখভ ও বার্নার্ড শর মধ্যে দেখি।

এই দেখাটা আমার নতুন হয়েছে। এতোকাল আমি শরৎচন্দ্রের লেখার প্রতি উন্নাসিক ছিলাম বেশী মাত্রায়। দেবদাস পড়ে কেঁদেছি, চরিত্রহীনের সতীশ হতে ইচ্ছে হয়েছে—গৃহদাহের মহিমকে বোকা মনে হয়েছে—পল্লীসমাজের রমা যেন পুতুল। শ্রীকান্ত সেজে বাউণ্ডুলে হতে সাধ ছিল। দত্তার নরেণকে ভাল লেগেছে—'মহেশ'য়ের গফুরের জন্য কান্নায় ফেটে পড়েছি—কিন্তু মনে হয়েছে শরৎচন্দ্র বেশী মাত্রায় Sentimental তার চেয়ে বড় কিছু নয়। কারণ আমার মন-মুক্ত-বিহঙ্গ কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের আকাশে দীর্ঘ ডানা মেলে উড়ে চলেছে টলস্টয়, পুসকিন, গোগল, তুর্গেনিভ্, চেখভ্, মোপাসাঁ, জোলা, ফ্লবেয়র.রোমাঁ রোলা, ন্যুট হামসান্, বাওয়ার, ডিকেন্স, অসকার ওয়াইল্ড, টমাস হার্ডি, জেমস্ জায়েস্, গলস্ ওয়ার্দি, ফকনার, হেন্‌রী জেমস্, এড্গার এলান্‌পো, হেমিংওয়ে, মেতারলিঙ্ক, মার্কটোয়েন, হথর্ণ, কেম্যু ও সাঁত্রের খোঁজে। নভোকব ও আলবার্তো মোয়াভিয়ার লেখা সমারসেট মমের মত গোগ্রাসে গিলেছি। বার্ণার্ডশ'র নাটক রসে নিজেকে জারিত করবার চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রনাথ এখন জীবনবেদ। শরৎচন্দ্রকে মনে হয়েচে ছিঁচ্ কাঁদুনে লেখক। তাঁর চেয়ে তারাশঙ্কর, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে হয়েছে।

কিন্তু এই চিত্তবিভ্রান্তি দূর হ'ল হঠাৎ একদিন। সাহিত্য মোদী, সুলেখক আই, জি, রঞ্জিৎ গুপ্ত আই, পি,র সঙ্গে মোটরে যেতে যেতে তিনিই প্রথম শরৎ-সাহিত্য প্রসঙ্গ অবতারণা

করেন। তিনি শরৎ সাহিত্যের মধ্যে এক Philosophy খুঁজে পেয়েছেন—এবং তা নিয়ে তিনি গবেষণা সুরু করেছেন। তিনি বলেই ফেললেন কথা প্রসঙ্গে—শরৎচন্দ্র যথার্থই বিদ্রোহী ছিলেন। আমিও আবার শরৎসাহিত্য নিয়ে সমীক্ষা শুরু করলাম। এবং যতই শরৎ সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করি, তখনি কে যেন কানে কানে বলে—পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ ?

সত্যি আমি পথ হারাই—যখন 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে আসি। কমললতার চরিত্র-আলোচনা করতে গিয়ে মনে হলো শরৎচন্দ্র তাঁর সবটুকু প্রতিভা বিলিয়ে দেন কমললতার মধ্যে। আর আমি হারানো দিনের সরণি বেয়ে চলে এলাম গুস্তাভ ফ্লবেয়রের সাহিত্য তীর্থ তীরে যেখানে সর্বপ্রথম 'ন্যাচারালিজম্'এর যজ্ঞ শুরু হয়েছিল ঋভু ঋতুবাক ফ্লবেয়রের অগ্নিগর্ভ বেদমন্ত্রে। সেই ওঙ্কারে সাড়া দিয়ে আর সবাই আগ্নহোত্রী হন। শরৎচন্দ্র যেন এমিল জোলা ও মোপাসার সিদ্ধ উত্তর-পথিক। শরৎচন্দ্র নিঃসন্দেহে ন্যাচারালিষ্ট—এখানে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তাঁর 'ন্যাচারালিজম্' এমন এক স্থানে উদয়াচলপথগামী হয়েছে সেখানে তাঁকে অনুসরণ করবার আর কেউ নেই। এই জন্য হয়তো তাঁকে একদল সমালোচক Realist শরৎচন্দ্র বলে তার প্রশংসা করেন। এখানেই শরৎচন্দ্রের ছিল প্রচণ্ড আপত্তি। এই আপত্তির কারণও সুস্পষ্ট। আমি আগেই বলেছি—তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় ফোটোগ্রাফার। ফোটো তুলবার সময় ক্যামেরা Movementএর দক্ষতা থাকা চাই—এই দক্ষতাই হল Idea—এবং শরৎচন্দ্র নিজেকে idealist বললে সবচেয়ে বেশী আনন্দ উপভোগ করতেন।

ন্যাচারালিষ্ট নাট্যকার তো জর্জ বার্ণার্ড শও ছিলেন—কিন্তু realismএর ধোঁকা তাঁকে দিতে হয়নি—স্যাটায়ার যাঁর অক্ষয় তূণ (বাংলা দেশে প্রমথনাথ বিশী নিজেকে বার্ণার্ড শ অফ্ বেঙ্গল

বলে ভাবেন—অবশ্য এই পিঠ চুলকুনিতে ওস্তাদ গজেন্দ্র মিত্র) তিনি realist হতে যাবেন কোন দুঃখে। শরৎচন্দ্রও তাই। তিনি এক হাতে অনুবীক্ষণযন্ত্র এবং অপর হাতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে সমাজ ও সমাজের মানুষদের দেখতে এসেছেন। দেখাতে আসেননি কিছু। শোনাতে চাননি কোন কথা—শুনে গেছেন। তাই তাঁর সাহিত্যে এতো ঋক্ সমৃদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে।

প্রথম প্রথম মনে হতো—ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর শরৎচন্দ্রের চেয়ে ক্ষমতাবান। কারণ রাঢ় বাংলার মূল কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজ, উপজাতি, অর্থনৈতিক দূরাবস্থা যে বলিষ্ঠ লেখনিতে তুলে ধরেছেন তা তো শরৎসাহিত্যে দেখিনা। কথাটা যথার্থই বটে। কিন্তু মনে রাখতে হবে তারাশঙ্করের আগমন প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝখানে—তখন ইয়োরোপীয় সাহিত্যের বিশাল টাইডাল ওয়েভ আছড়ে পড়ছে বাংলা সাহিত্যে। শিল্প-বিপ্লব, শ্রেণীদ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক মতবাদ—সামাজিক অবক্ষয়, যৌন চিন্তা সবগুলি কালিকলম ও কল্লোল গোষ্ঠীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে—দেখা দিয়েছে রাজ্য জোড়া অর্থনৈতিক সমস্যার সর্বনাশা ছবি। এই সময়ে তো শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিক রূপে তুঙ্গে অবস্থান করছেন। আর তারাশঙ্কর সাহিত্যে আঞ্চলিকতা বোধের আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক গল্পকার রূপে তারাশঙ্কর সর্বশ্রেষ্ঠ। সেখানে তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। কিন্তু এই আঞ্চলিক সাহিত্যের প্রদীপ জ্বালালেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রও রাঢ় বাংলার দিকে সর্বপ্রথম দৃষ্টি দিয়েছেন—কারণ প্রকৃত বাংলার চিত্র পাওয়া যায় রাঢ় ভূমিতে। তবে শরৎচন্দ্র তারাশঙ্করের মতো নিছক রাঢ় ভূমির ছবি তোলেননি—তিনি রাঢ় ভূমির সমস্যা বহুল নির্যাসকে অখণ্ড বঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাই টমাস হার্ডির ওয়ে সেক্স্ অঞ্চল ন্যুট, হামসান্, ফকনারের মিসিসিপি জেমস্ জয়েস, স্টেনবেক, তারাশঙ্কর, মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত নিছক আঞ্চলিক সাহিত্য কুণ্ডে অবগাহন না করে শরৎচন্দ্র গঙ্গাতীর্থে স্নানে নেমেছেন—বিশ্বমানবিকতবাদকে স্বীকৃতি দেবার জন্য। শরৎ-সাহিত্যের মধ্যে ন্যাচারালিজম্ ও রিজিওন্যালিজম্--এই দুটোর মিশ্রিত রস এক অখণ্ড-বাজ্য সৃষ্টি করবাব জন্য স্তবীভূত হয়ে জমাটবদ্ধ হ'ল—এবং তা সম্পূর্ণ নতুন ভাবে রূপান্তরিত হল। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের Puritanism and the Arts কে সমূলে কুঠারাঘাত করলেন।

D. H. Lawrence এক স্থানে ইংরেজী সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে বলেছেন—"It is an old fear, which seemed to dig into the English soul at the time of the Renaissance. Nothing could be more lovely and fearless them chaucer. But already Shakespeare is morbid with fear, fear for consequences. That is the strange Phenomenon of the English Renaissance, this mystic terror of the consequences, the consequences of action.

শরৎচন্দ্র fear কে অগ্রাহ্য করেছেন, কিন্তু this mystic terror of the consequences' কে কি স্বীকার করেছেন সেটা ভাববার বিষয়।

তিনি 'Mystic'কে ভালভাবেই আত্মস্থ করেছেন তার বহু প্রমাণ আছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সুবিশাল সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে আমি বসিনি। আমার আলোচ্য বিষয় একটি—তা হ'ল শ্রীকান্তের কমললতা।

শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব-কালে ইয়োরোপীয় সাহিত্যে ফ্রয়েড্, মার্কস, এঙ্গেলস্, হ্যাবলক এলিস্ কে নিয়ে খুব জয়ঢাকা পেটানো হচ্ছিল—সে-বাদ্যি কিন্তু এখনো থামেনি। তিনি সব গ্রহণ করেছেন —কিন্তু সব বিশ্লেষণ করে একটা বস্তুকে গ্রহণ করেছেন—সেটা

নারী ও তার নারীত্ব। এবং তা হল—Metamorphosis বা রূপান্তর। এই রূপান্তরই তো তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। নারীর যে একটা জীবন একটা স্পন্দন আছে—তা কেউ স্বীকার করেননি, শরৎচন্দ্র সেটা স্বীকার করেছেন। শরৎ সাহিত্যে নারী হল মহিমান্বিতা—সে কোন মতেই অবজ্ঞার পাত্রী নয়—সেটা কিছুটা দেখি মোঁপাসা ও সমারসেট মমের সাহিত্যে। শরৎ সাহিত্যে 'নারী' ভাবটি প্রবল ভাবে প্রকটিত হয়েছে। এখন যদি লরেন্সের ভাষায় প্রশ্ন করা হয়—"How do we feel about the novel? Do we bounce with joy thinking of the wonderful novelistic days ahead? Or do we grimly shake our heads and hope the wicked creature will be spared a little longer? Is the novle on his death bed, old sinner?"

তার উত্তর লরেন্স দিলেন "There he is, the monster with many faces, many branches to him, like a tree; modern novel. And he is almost dual, like Siamese twins. On the one hand, the pale-faced, high browed, earnest novel, which you have to take seriously; on the other, that smirking, rather plousible hussy, the popular novel."

শরৎচন্দ্রের 'পপুলার নভেল' তাঁর নায়িকাদের নায়িকাতত্ত্বের জন্য। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি ধারায় বিভক্ত করেছে[১] কিন্তু কোথাও তিনি শরৎসাহিত্যে নারীদের নিয়ে নির্মল আলোচনা করেন নি। নারীর প্রতি সহজাত অনুভূতি যে শরৎ সাহিত্যে স্পন্দিত হয়েচে তার চূড়ান্ত প্রতিফলন দেখি শ্রীকান্তের কমললতার মধ্যে। বোষ্টমী কমললতার মধ্যে ক্ষেমেন্দ্রের রাধাকৃষ্ণেরলীলা বাদ ফোটাননি শরৎচন্দ্র—যথা :—

"ললিত-বিলাস-কলা-সুখ-খেলন-ললনা-লোভন-শোভন-যৌবন-মানিত-নবমদনে।

১। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা দ্রষ্টব্য।

অলিকুল-কোকিল-কুবলয়-কজ্জল-কাল-কালিন্দসুতা-মিব লজ্জল-কালিয়কুল দমনে।

বৈষ্ণবী কমললতা কতখানি বৈষ্ণব তা ব্যাখ্যা করাই আমার কাজ। কমললতাকে পেতে গেলে বৈষ্ণব-সাহিত্যের নৌকাখণ্ডের একটা গান মনে পড়ে।

"পার কর হে ধীবর মাঝি বেলাপানে চেয়ে।
দধি দুগ্ধ নষ্ট হলো বিকী গেল বয়ে।
(কৃষ্ণ) সব সখীকে পার করিতে নব আনা আনা।
শ্রীরাধাকে পার করিতে লই কানের সোনা।

কমলতার ভরা-যৌবন রাশিকে একমাত্র একজনের কাছে উৎসর্গ করতে সে প্রস্তুত হয়েছে—সে কোন মানব নয়। মর্তের মানবের উপর যেন তার তীব্র ঘৃণা। এ-ঘৃণাভাবের কিন্তু তার চূড়ান্ত প্রস্তুতি তার ছিল না।

এখানে শরৎচন্দ্র একটি বিদ্রোহী লেখক রূপে যেন আত্মপ্রকাশ করেছেন। তুর্কি আক্রমণের সময়ে থেকে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের আবির্ভাব পর্যন্ত বাংলায় জাতীয় জীবনতে এক শক্তিশেল লেগেছিল—তাতে বাঙ্গালীর জীবন-ধর্ম-সংস্কৃতি সবই খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায় এবং যে বৌদ্ধ ধর্ম মানবতাবাদের উদার ধ্বনি তুললেও সে-ধর্ম আপামর জনসাধারণকে একান্তে আনতে পারে নি। এদিকে তুর্কি-আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নিম্নকোটী মানুষ ইসলামের উদার আহ্বানে ছুটে গেল—হিন্দু ধর্মেব মধ্যে তখন ব্রাহ্মণতন্ত্র প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সমান ভাবে পদদলিত করা শুরু করে। জাতির এই দুর্যোগ মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব—তাঁর নব্য - বৈষ্ণব ধর্মের কাছে সবাই সমান হয়ে দেখা দিল—যা বৌদ্ধ বা ইসলামের মধ্যে পাওয়া গেল না। চৈতন্যদেব হিন্দুধর্মকে অগ্রাহ্য করেন নি—তার মলিনতা দূর করবার জন্য চণ্ডীদাসের গান স্মরণ করলেন—

"সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

চৈতন্য বিপ্রবর্ণহীন নিম্নকোটী মানুষের ঘরে ঘরে গেলেন আহার ও বিশ্রাম নিতে—এই মাধুকরী বৃত্তিই এনে দিল নব-জাগৃতির ঢংকা ধ্বনি। তার মানে হিন্দু ধর্ম হয়ে উঠলো আরো মহিমান্বিত। এই বৈষ্ণব ধর্মের অগ্রগতির ফলেই কমলতার মত নিম্নবর্ণের নারী এই সমাজের আশ্রয় পেল—হয়ে উঠলো বৈষ্ণবী। কিন্তু তারপর। শরৎচন্দ্র দেখেছেন রাঢ় বঙ্গের নীচ-হিন্দুরা ব্রাহ্মণ তন্ত্রের দ্বারা কীভাবে নিপীড়িত হচ্ছে। তিনি দেখেছেন এই ব্রাহ্মণ তন্ত্রের কাছে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের দুর্বল পরিবারবৃন্দ দিনে দিনে ধুলিস্যাৎ হয়ে পড়ছে। এবং তিনি জানেন এই সামাজিক বিপর্যয় থেকে একমাত্র রক্ষা করতে পারে হিন্দু ধর্মই—যে ধর্মকে সংস্কার করেছেন রামমোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। চৈতন্যদেব তো আছেনই। আর বৈষ্ণব সবাইকে দিতে পারে কোল।

তাই কমললতা বৈষ্ণবী হয়েছে। কিন্তু এই নারী কি চেয়েছে জীবনে? সে তো কান্ত-প্রেমে মাতোয়ারা হতে চেয়েছে। কমললতাব দিকে চেয়ে মনে পড়ে—একটি প্রাকৃত পৈঙ্গলের কবিতা—

"সো মহ কন্তা, দূর দিগন্তা। পাউস আত্র, চেউ চলায়ে॥
সেই মোর কান্ত, (এখন) দূর দিগন্তে। প্রাবৃষ আসে চিত্ত চঞ্চলিত।
গজ্জই মেহ কি অম্বর সামর। ফুল্লই নীব কি বুল্লই ভামর॥
একল জীয় পরাহিণ অম্মহ। কীলউ পাউস কীলউ মম্মহ॥

অর্থাৎ "মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, অম্বর শ্যামল, নীপ ফুটিয়াছে ভ্রমর বুলিতেছে। আমার জীবন পরাধীন; প্রাবৃষ ক্রীড়া করুক, মন্মথও ক্রীড়া করুক।"

কমলতার ভরা যৌবন লুব্ধ করেছে শ্রীকান্তকে। কিন্তু শ্রীকান্ত জেনেছে—এই নারী কি চায়।

অর্থাৎ এতোদিন ধরে কমলতা বলে থাকতে পারে, সখি কি করি, কান্ত যে পাশে থাকে না।

কমলতা যখন শ্রীকান্তকে দেখলো ও তার উদার মানবতাবাদের সাড়া পেলো তখন হয়তো মনে করেছিল তার জীবন দেবতা মানবে রূপান্তরিত হয়ে তার কাছে এসেছে। হয়তো জৈন কবির দোহা মনে হয়েছিল—

"জই কেঁবই পাবীসু পিউ অক্কই কোডি করীসু।
পাণিউ নবই সরাবি জিঁব সব্বংগে পইসীসু॥"

আর্থাৎ যদি কোনমতে প্রিয়কে পাই কাছে তাকে গাঢ় আলিঙ্গন করি, এবং নব শরায় জলের মতো সর্বাঙ্গে শুষিয়া লই।"

কিন্তু বৃন্দাবন পথযাত্রী কমলতা বৈষ্ণব ধর্মের গোঁড়ামিকে অগ্রাহ্য করে যেন সুফী হতে চলেছে—।

রেলওয়ে প্লাটফর্মে রাতের অন্ধকারে কমললতাকে দেখলে সুফী কবি শাহ ফরিদুদ্দীনের গান মনে পড়ে :—

"তপি তপি লুপি লুপি হাথ সরোডই।
বাওলী হোস সো শহু লোরউ॥
তই সহি মন মহিঁ কীয়া রোষ
মুঝ অওগণ সহি (তাস) নাহি দোষ॥
তই সাহিব কী মই সার ন জানী।
জোবন খোই পাছই পছতানী॥
কালী কোইল তু কিতগুণ কালী।
অপনে প্রীতমকে (হউ) বিরহই জালী॥
পির হি বিহূণ কতহি সুখ পায়ে।
জো, হোই কৃপালু তা প্রভু মিলায়ে॥
বিহূণ খুহী মুন্ধ ইকেলি।
না কো সাথী না কো বেলী॥
করি কিরপা প্রভু সাধসঙ্গ মেলী।

জা ফিরি দেখা তা (মেরা) অল্লাহ্ বেলী ॥
বাটা হমারী খরীউ ডীনী।
খন্নি অহু তিখী বহুত পিঙ্গণী ॥
উস উপর হই মারগ মেরা।
শেখ ফরীদা পন্থ সমহারি সবেরা ॥"

অর্থাৎ "বিরহ চরে পুড়ে পুড়ে আমি যুক্ত কর হই, বাউলী হয়ে আমি স্বামীকে খুঁজছি। সখি, সে মনের মধ্যে রাগ হচ্ছে আমারি গুণহীন তাই দায়ী, সখি, তাঁর দোষ নেই। সেই স্বামীর আমি সার ধর্ম জানলাম না, যৌবন হারিয়ে শেষে অনুতাপে জর্জরিত হচ্ছি। কালো কোকিল, তুই কী কালো। আমার প্রিয়ের বিরহে আমি পুড়ছি। বিরহ কষ্টশূন্য কোকিল কত সুখ পায়। যে দয়ালু হয় সে প্রভুর সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দেবেন। দুঃখের কূপে আমি একাকী নারী। না আছে কোন সঙ্গী, না আছে কোন সাহায্যকারী। কৃপা করে প্রভু সাধু সঙ্গ দিয়েছেন। কিন্তু যখন ঘরে ফিরি দেখি তখনই ঈশ্বরই আমার সহায়। না আমার দুর্গম দূরত্যয় খড়োর মত তীক্ষ্ণ ও অতি সংকীর্ণ। তাহারই উপর দিয়ে আমার পথ শেখ ফরিদ, বেলাবেলি পা চিনে নিতে হবে।"

শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের কমললতার মধ্যে একটা সুর খুঁজে পেয়েছেন তা হলো—'কলহান্তরিতার তুক'—অর্থাৎ

"তোমায় নিতে আসি নি।
গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠছো কি হে, তোমায় নিতে আসিনি
আমি ফুল নিতে এসেছি। কৃষ্ণকলি ফুল নিতে এসেছি।
বাসী ফুলে হবে না। ঝরা ফুলে হবে না।
মা রাজার পূজা হবে, করবে পূজা কমলিনী।"

কোন ফুলে কমললতা পূজা করবে? কেন স্থলপদ্ম দিয়ে।

তারপর। তারপর আমরা এবারে শ্রীকান্তের কমললতার হৃদয় কন্দরে প্রবেশ করি।

এক

শিল্পী শরৎচন্দ্রের নারীদরদী মন

যন্ত্রণার যুগে শ্রীকান্তের কমললতার আবির্ভাব। যেখানে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে চরিত্র-বিশ্লেষণতার সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের নিদারুণ আঘাত ধরা পড়েছে। এবং সেই 'ধরা-পড়া' ভাবটাই বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। কিন্তু এখানে শরৎচন্দ্র অতি সন্তর্পণে তাঁর সাহিত্যের পথ-পরিবর্তন করেন। তাঁর লেখনীতে যে সমাজ ধরা পড়েছে তা সংস্কার মুক্ত নয়— এবং বহু সংলাপ প্রধান অর্থনৈতিক-দুঃসময়ের দুর্দশা নয়—তা হ'ল মানব-মানবী মনের হৃদয়াবেগ ও সংস্কার—যার মধ্য দিয়ে তিনি মানুষকে বিদ্রোহ করবার চূড়ান্ত অনুপ্রেরণা দিয়েছেন— যা দিতে পারেন নি, বঙ্কিমচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথ। তাই পণ্ডিত প্রবর শ্রীরঞ্জিত গুপ্তের কথায় বলা চলে—শরৎচন্দ্র হলেন বিদ্রোহী শরৎচন্দ্র।' এই বিদ্রোহী শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের চরিত্রগুলিতে দেখি—তারা অন্নচিন্তা চমৎকারা হয়ে আর অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে বজ্র-বাধা পেয়ে পিছু হঠে ক্রন্দন ধ্বনি তোলে নি—তাদের কণ্ঠে পার্বত্য নদীর উপল ব্যাথিত যে তীক্ষ্ণ গর্জন শুনি—তা হচ্ছে সংস্কারকে আঘাত হানবার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা। যেটা ন্যাচারালিজম্ এর প্রবক্তা গুস্তাভ্ ফ্লবেয়র বা এমিল জোলা বা মোঁপাসা বা টমাস হার্ডির লেখনীতে সামান্য ভাবে ধ্বনিত হয়েছে।

বর্তমানযুগের সাহিত্যিকরা যখন সমাজকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তুরপুন-বিদ্ধ করেছেন মাত্র—সেই ক্ষতের ব্যথা ধরতে পারলেন না—। শরৎচন্দ্র কিন্তু সমাজের যে সংস্কার তাকে ডায়নামিক

করবার প্রচেষ্টা চালালেন—কু-সংস্কারকে বিশাল বাহু দিয়ে ঊর্ধদিকে তুলে ধরেছেন গ্রীক্ বীর হারকিউলিসের মত। এবং জ্বালা ও যন্ত্রণার মধ্যে শরৎ সাহিত্যের চরিত্রগুলির মধ্যে দেখি—নারীর হৃদয় আর পুরুষের বুদ্ধি। যা সনাতন কাল থেকে সৃষ্টি কার্যের প্রধান সহায়।

শেলী বা বলতেয়রে ভাষা হ'ল পাপ-পঙ্কিল সমাজ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া। আর শরৎচন্দ্র হলেন ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টির—শ্মশান শূন্যতার স্থান নেই তাঁর লেখনীতে। আশাহত মানুষ আশা নিয়েই বেঁচে থাকে। সংস্কার তো জন্ম থেকে সহজাত প্রবৃত্তির মত আমাদের মনে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে থাকে। সেই চরম তথ্য ও তত্ত্ব জ্ঞান দিয়েছে শরৎ-সাহিত্যের নায়িকারা। কিন্তু কমললতা তা জেনেও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েনি—সে এগিয়ে গেছে। কারণ সে তো এ-কূল ও-কূল দুকূলই জেনছে। কিন্তু ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এই কমললতার চরিত্রে তেমন কিছু মহিমা দর্শন করেন নি বলে শরৎচন্দ্রের উপর দোষারোপ করেছেন।

"চতুর্থ পর্বে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল কমলতার। এই কমললতার কাহিনী চমকপ্রদ, তাহার মাধুর্য সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কমলের চরিত্র কলঙ্কালপ্ত হইলেও তাহার মধ্যে ঔদার্য, মহত্ত্ব ও ত্যাগশীলতার অভাব নাই। কিন্তু তবু এ চিত্র শরৎচন্দ্রের শিল্পকলার খাঁটি নিদর্শন নহে; কারণ এই রমণীতে শরৎচন্দ্রের নায়িকার বিশিষ্ট ছাপটি নাই। কমললতা বধবা, বাড়ীর সরকারের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে সে হইল সন্তানের জননী। এই কলঙ্ককে স্বীকার করিয়া লইবার জন্য সে বৈষ্ণবী হইল, কিন্তু দেখিতে পাই যে নূতন ধর্মে দীক্ষিত হইয়া সন্তানকে জন্ম দিয়া সে আর তাহার পূর্ব প্রণয়ীকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে, যদিও তাহার নূতন ধর্মকে মানিতে হইলে এই লোকটিই তাহার স্বামীপদ বাচ্য। ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার কারণ স্পষ্ট হয় নাই। বোধ

হয় এই লোকটির চরিত্রের বর্বরতাই কমললতাকে ইহার প্রতি বিরূপ করিয়াছে। কিন্তু প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শরৎচন্দ্রের অন্যান্য নায়িকার বৈশিষ্ঠ্য, কমললতায় তাহার আভাস মাত্র নাই।

গহর গোঁসাই এই রমণীর জন্য নিজেকে ব্যর্থ করিয়াছে। তাহার শেষ রোগ শয্যায় কমললতা অমানুষিক সেবা করিয়াছে, কিন্তু এই সর্বত্যাগী প্রণয়ীকে কেন যে সে প্রত্যাখান করিল, তাহারও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শ্রীকান্তের প্রতি তাহার অনুরক্তি আছে, হয়ত এই অনুরক্তি প্রণয়ে রূপান্তরিত হইত, কিন্তু উভয়ের মাঝখানে রহিয়াছে রাজলক্ষ্মী। কৈশোরে বৈধব্য হইতে নির্বাসন পর্যন্ত বহু অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া গিয়াছে, ইহাতে তাহার চিত্ত নিপীড়িত হইয়াছে, উচ্ছ্বাসিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার অন্তঃস্থলে যে রহস্য রহিয়াছে। গ্রন্থকার তাহাকে সম্পূর্ণ উদঘাটিত করেন নাই।"[১]

ডক্টর সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত বিখ্যাত সমালোচক রূপে বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর উক্তি নিশ্চিত ভাবে প্রনিধান যোগ্য। তবু বলবো তিনি কমললতার গভীর হৃদয়ে অবগাহন করতে পারেন নি। আর শরৎচন্দ্র যে কমললতাকে ভাল করে অঙ্কিত করেন নি সেটাই শরৎচন্দ্রের বিরাট নিপুন Art—এই নায়িকাকে স্বল্প পরিধির মধ্যে এঁকে তিনি পাঠকদের কাছে দিয়েছেন—তাকে বুঝবার জন্য। পাঠক যদি বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর সন্ধান পান—তাতে ক্ষতি কি! কমললতা-সৃষ্টির উল্লাসে শরৎচন্দ্র যতখানি মুখর নন পাঠক তার চেয়ে বেশী দিগ্‌ভ্রান্ত। সমালোচকের মন-প্রাণ কমললতার অসীম দর্শনের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

কমললতার প্রেম কতখানি প্রাণবন্ত সেটা বিচার্য বিষয়। কমললতার ধর্ম কতখানি সত্য তাও দেখতে হবে। তার Matter, Life and mind নিয়ে আলোচনা করি—দেখি তার Agnostic Prelude। তার স্বভাবের বৈচিত্র কোথায়? তার সংলাপ, প্রেম

১। শরৎচন্দ্র—ডঃ সুবোচন্দ্র সেনগুপ্ত পৃঃ ৪৩-৪৪

তার বিষয়বস্তু এলো কোথা থেকে ? সে কি নারী প্রকৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে।—না বলবো—

"The first morning of creation wrote What the last Down of Reckoning shall read—"

একটা মহৎ-সৃষ্টির জাগৃতি-বাণী নিয়ে যদি কমললতার দিকে চেয়ে বলি, "A little modesty and a little honesty are enough to assure us that life and the world are too complex and subtle for our imprisoned minds. Very probably our most honoured theories would from a subject of irony and pity among omniscient gods; and all that we can do is to pride ourselves on having discovered the abysses of our ignorance. The more we learn the less we know; every advance reveals new mysteries and new uncertainties; the molecule discloses the atom, the atom discloses the electron, the electron discloses the quantum, and the quantum defies and overleaps all our categories and all our laws."১

ভাব থেকে জড়ের উৎপত্তি। এই জড় অর্থাৎ বস্তু হল কমললতা—তাকে আনবিক শক্তি দিয়ে প্রাণবন্ত করেছে প্রকৃতি। মানুষের জীবনে যে সহজাত প্রবৃত্তিগুলি আছে সেগুলি এই নারীর মধ্যে বর্তমান। এই জন্যই বোধ হয় প্রথম দর্শনে কমললতাকে মনে হয়েছিল এ-র মধ্যে পাবো বোষ্টম ধর্মের নেড়ানেড়ীর কাণ্ড—যা ভগবানের নাম মুখে নিয়ে দৈহিক লালসা ভোগ করবার যথেষ্ট উৎসাহ জোগায় আর শ্রীকান্ত বোধ হয় তার মধ্যে জড়িয়ে গেল। কিন্তু কমললতাকে উপলব্ধি করবার জন্য শরৎসাহিত্যের যতদূর আমি যাই দেখতে পাই এই নারী শত শত নারীর মধ্যে থেকেও আপন মহিমার দ্যুতি বিচ্ছুরণ করে চলেছে।

তার কারণ সাহিত্যে যদি Materialism ও Naturalism বলে

১। The Pleasures of philosophy—will Durant P P.34 35,

কোন বস্তুদ্বয় থাকে তা হলে বলবো কমললতার মধ্যে তা বহু মাত্রায় আছে।

কোন একটি বিশেষ ধর্মপথ-যাত্রী কমললতার প্রথম জীবনে "ভাব" বস্তুটি বর্তমান থাকলেও পার্থিব জীবনে শত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে সে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তার মধ্যে Matter ও Nature দুই পুরোমাত্রায় আছে। যদি আমি বলি—

"Aristotle, the biologist, found the world a changing and striving thing, and could not quite reduce it to "atoms and the void" its essence was entelechy—in every substance some potency was hidden that left no rest until it was realized ; every "form" was the "matter" of a higher form, and all reality was pregnant with development ; materialism could not adequately describe this burgeoning vitality."১

শরৎচন্দ্র কমললতাকে একটা limit এর মধ্যে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকান্তের কমললতা মুক্তাকাশের সন্ধান পেয়েছে জীবনের দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে এবং তার ফলে সুদূরের বলাকার মত আয়ত ডানা প্রসারিত করে সে দূরেরই পথ কেটে উড়ে চলেছে। তাই বোধ হয় কমললতার সীমা অতিক্রম করবার চেষ্টাই "Principle of undividuation" এর পর্য্যায় পৌঁচেছে। তার নারী মনের 'আত্মা' দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে আবার এই দুয়ের মধ্যে একটি সেতু রচনা করে তাকে অমৃতপদপথলোভী করেছে সেটা যেন উপনিষদেরই 'ভাব'।

কমললতা জীবনে নরকের অনেক রাজা মহারাজার সান্নিধ্য পেয়েছে—তারা তাকে শুনিয়েছে 'Philosophy of the Luciter'। কিন্তু ত্রিশ বছরের নারী বর্তমানে তার দুরন্ত যৌবনের তপ্ততাকে অস্বীকার করে যে সাধনমার্গে যাত্রা করেছে সেখানে সে নিশ্চিত

The pleasures of philosophy—will Durant P.P, 34-35.

ভাবে বলতে পারে "I think, therfore I am" এবং এই নারীর মানবিক মনে ছুটো বস্তু পাশাপাশি বিরাজ করছে। একটা মানবিকতা অন্যটি আত্মতান্ত্রিকতা। যে মন আনবিক শক্তির ভেতর থেকে উৎসারিত হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহ ও চৌম্বকত্ব—সেইরূপ কমললতার মধ্যে থেকে সৃষ্টি হচ্ছে ভাবতন্ময়তা ও তার সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণশক্তি যার দ্বারা গহরকবি ও শ্রীকান্ত বন্দী হয়েছে পাশাপাশি আর এই উভয় A. C. কারেন্টের চৌম্বকপৃষ্ঠ হয়েছে। কমললতার মনের মধ্যাকর্ষণশক্তি অতি প্রবল ও তীব্র—যা শরৎসাহিত্যের আর কোন নারীচরিত্রের মধ্যে দেখি না। কবি গহর প্রকৃতি প্রেমিক। সে এই বৈষ্ণবী নারীর মধ্যে প্রকৃতিরই চিত্র দেখেছে—সে পেয়েছে প্রকৃতির স্পর্শ—সে তার উদাসী মনকে সমর্পণ করেছে এই নারীর কাছে। কিন্তু তার বদলে সে কি পেলো কমললতার কাছ থেকে তা নিয়ে চিন্তিত নয়। আর শ্রীকান্ত তো কমললতাকে অস্বীকার করে রাজলক্ষ্মীর আঁচলের ছায়ায় যত আশ্রয় নিতে চেয়েচে, ততই তাকে কে যেন সবলে সস্নেহে মুরারীপুর বৈষ্ণব আখড়ায় টেনে এনেছে। আনবিক শক্তি ভাঙ্গবার পর যে প্রোটন উৎসারিত হয়—তা হল নারী মনের প্রেম—এই প্রেম—প্রোটনই শ্রীকান্তকে বারম্বার গুটিয়ে আনছে কমললতার কাছে। বৈজ্ঞানিক ও সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গীতে যদি কমললতার মনকে বিশ্লেষণ করি তা হ'লে Le Bon এর ভাষায় বলতে হয়—"The elements of atoms which are dissociated...are irrevocably destroyed. They lose every quality of matter—includiug the most fundamental of them all, weight. The balance no longer detects them. Nothing can recall them to the state of matter. They have vanished in the immensity of the ether.. Heat, Electricity, Light etc,...represent the last stage of matter before its disappearence in to the ether—".

অতএব আমি এই নারীর মনের 'ইথার' বার করতে চাই নে। আমার বক্তব্য—নীতি বিজ্ঞানী সিড্‌উইকের বক্তব্য—প্রায়—in order to get pleasuree one must forget thems." অতএব সুখ চাই, এই চিন্তাই যদি মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে তাহলে যে সব স্বাভাবিক পরিতৃপ্তিব দরুণ সুখ সেগুলির দিকে আর মন থাকে না। এখানে কমললতা যদি সংসার সুখ সর্বান্তকরণে পেতে চাইত তা হলে সংসারটাকে ভাল করে দেখা উচিত ছিল। আর আধ্যাত্মিক-জীবনে নিবিড় শান্তি লাভ করতে চাইলে আধ্যাত্মিকতার প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করতে চেয়েছে। সাধন-পূজন খেলা খেলতে চেয়েছে। কমললতার জীবনের মূল সমস্যার সমাধান পাওয়া গেলে তারই সঙ্গে পাবো তার আর আর সমস্যাগুলি। এবং কমললতা শুধুমাত্র যৌন-পরিতৃপ্তির খোঁজে গিয়ে কি রকম আঘাত খেয়েছিল তা আমরা জানি। এও জানি কমললতার জীবনে এই যৌন-ক্ষুধা অল্পকালের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। যা কিরণময়ী অথবা কমলের হয় নি। কমল তো সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চলে গেছে। কিন্তু বিদ্রোহী শরৎচন্দ্র একমাত্র বিদ্রোহিণী করতে পেরেছেন কমললতাকে। শরৎচন্দ্রের নারীদরদী মন সর্বদা জেহাদ ঘোষণা করেছে 'নারীর উপর যে সামাজিক বলাৎকার' তার বিরুদ্ধে। নারী যেন পুরুষ ও সমাজের কাছে একটি পণ্যবস্তু। আর নারীকে ভাঙ্গিয়ে সমাজ ও পুরুষ বেঁচে আছে। শরৎচন্দ্র যা বলতে চেয়েছেন—তার মধ্যে সমাজবাদের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। যদি বলি তিনি ভাবতেন—শ্রেণী সমাজের কাছে নারীজাতির পবিত্রতা রক্ষার প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর। কেননা, শ্রেণীসমাজের ভিত্তিই হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আর তাই এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির নির্ভুল উত্তরাধীকারী নির্ণয় করাই শ্রেণী সমাজের একটি বড়ো মাথা ব্যথা। উত্তরাধীকারী যদি নির্ভুল না হয় তা হলে তো ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রায় বেহাত হবারই সামিল। এই কারণে,

শ্রেণী সমাজে নারীর জীবনের উপর অতি সতর্ক নিষেধাজ্ঞা। নারী তাই দুর্লভ সামগ্রী,—দুর্লভ বলেই লোভনীয়, লোভনীয় বলেই তার ছবির লোভ দেখিয়ে যে-কোনো পণ্যবস্তুকেই বাজারে কাটানো সহজসাধ্য। ফলে অবস্থাটা মোটের উপর এক উৎকট পরিহাসের মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছে ; নারীজীবনের শুচিতা রক্ষা করার তাগিদই নারীকে আজ পরম পণ্যে পরিণত করছে।"

নারী বা পুরুষের যৌন-জীবন সমস্যা খুবই কঠিন—শরৎচন্দ্র তা এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর লেখনী অতি গোপনে তা আবার মাঝে মাঝে প্রকাশ করেছে। পল্লীসমাজ থেকে শুরু করে বামুনের মেয়ে আবার গৃহদাহ, চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত, (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ) থেকে শেষপ্রশ্ন সর্বত্র এক বিরামহীন প্রশ্ন উঠেছে। অবশ্য কথাশিল্পী তাকে চাপিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছেন—নীতি জ্ঞান দিয়ে। তাই চরিত্রহীনের সাবিত্রী সতীশকে মন দিয়েছে—দেহটা দিতে পারে নি।

অর্থাৎ সমাজের গ্লানি, কুসংস্কার অশিক্ষিত ও বিবেকহীন পরিবেশ দক্ষ ভাবে ফুটিয়ে তুললেও তিনি নর-নারীর মিলনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরীয় উদার নীতিকে কিছুতে গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু কমললতার দ্বারা তা করাতে পারতেন যে-হেতু তিনি কণ্ঠী বদল করে বোষ্টমী করেছেন এই নায়িকাকে। তাও করালেন না অবশেষে। অর্থাৎ তিনি দেখাতে চেয়েছেন নারী জাতি সামাজিক ভাবে মুক্ত নয়। আবার আমরা দেখি যেমন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের বিরাম নেই—ঠিক তেমনি যৌনক্ষুধা ও মনের সঙ্গে নারীর সংগ্রাম বিরামহীন। শরৎচন্দ্রের কমললতার দিক থেকে দেখতে গেলে এই সমস্যার গুরুত্ব অতি তীব্র। "–এই সমস্যার সূত্র ধরে এগোলে দেখা যায় এরই মধ্যে জীবনের একটি মূল সমস্যার বিকাশও। এবং এই দিক থেকে এগোবার চেষ্টা করেছি বলেই শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি

সেটা হলো জীবনের মূল সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন থেকে নিছক যৌন সমস্যাকে স্বতন্ত্র ও একান্ত সমস্যা হিসেবে দেখবার চেষ্টা করলে তার প্রকৃত সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভবই নয়। তার মানে, যৌন জীবনের সমস্যা ঠিক কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এ-কথার জবাব দিতে হলে সর্বপ্রথম সমস্যাটাকে স্পষ্টভাবে চিনতে পারা দরকার। এ-সমস্যা ব্যক্তিগত পরিতৃপ্তি সন্ধানের সমস্যাই নয়। ঐ পরিতৃপ্তির উপর দৃষ্টি যদি একান্তভাবে আবদ্ধ থাকে তাহলে তা অসুস্থতার লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তার দরুণ আর যাই হোক প্রকৃত তৃপ্তির আশাও থাকে না। অপরপক্ষে সমস্যাটাকে ঠিক মতো চিনতে পারলে বোঝা যায় এটা বৃহত্তর সামাজিক সমস্যার অঙ্গ। এবং সেই বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা যে-হেতু গভীর ও গুরুতর সেই হেতু তার অঙ্গ হিসেবেই যৌন জীবনের সমস্যার গুরুত্ব অকিঞ্চন।" শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে যেমন মানব-সভ্যতার পুরাতন পদ্ধতিটা ভেঙ্গে গেছে—ঠিক সেই মত নরনারীর জীবন যাত্রার চিন্তা পদ্ধতি দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে। এই হওয়া শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে পেলাম না।

এঙ্গেল্‌স্‌ এক স্থানে বলেছেন "ধনতান্ত্রিক সমাজের গভীরে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তারই আণবিক সংস্করণ হলো আজকের নরনারী-সম্পর্কের অন্তর্দ্বন্দ্ব। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি এই কথাটাই আরো স্পষ্টভাবে বোঝাতে চান। জীবের দেহ অসংখ্য ক্ষুদ্র কোষ দিয়ে তৈরি। কিন্তু জীবদেহের যে ক'টি মূল লক্ষণ, প্রতিটি কোষের মধ্যেও সেই ক'টি লক্ষণ চোখে পড়ে। আজকের সমাজকে যদি জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে প্রতিটি বিশিষ্ট পরিবারকে জীবকোষের মতো মনে করতে হবে। সমগ্রভাবে সমাজের মূলে যে-অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রতিটি পরিবারের মধ্যেই তা প্রতিফলিত।"

কমললতা একটি নারী

ফ্রয়েড বলেছেন—নারী মাত্রই পুরুষকে ঈর্ষা করে। কারণ তাহাদের দৈহিক গড়ন ও গঠন পুরুষের মত নয়। উপরন্তু পুরুষ নারীকে ভোগ করবার জন্য এসেছে—নারী পুরুষকে ভোগ করতে পারে না। ফ্রয়েডের এ-কথা বিজ্ঞান সম্মত কিনা জানি না। তবে শরৎসাহিত্যে এর কোন সমর্থন দেখি না। নারী পুরুষকে কতখানি ঈর্ষা করে-তা বলতে পারবো না। কিন্তু সে পুরুষকে ভালবাসে, তাকে আকর্ষণ করে ও নিজেকে ভোগ করবার প্রেরণা জোগায় তাতে সন্দেহ নেই। এই দুর্বলতার চূড়ান্ত সুযোগ নেয় পুরুষ। যেমন অর্থনীতির দিক থেকে নারীকে মুক্তি দেবার পরিকল্পনা চাই—তেমনি চাই সুস্থ ও সহজ যৌন জীবনের পক্ষে মেয়েদের মুক্তি। এই মুক্তি সমাজের প্রয়োজনবোধ এবং প্রয়োজনের তাগিদ। এই জন্য বোধ হয় শরৎচন্দ্র মানব জাতির কলুষতা দূর করবার জন্য দৃষ্টি দিলেন মানবীর দিকে। পুরুষদের দিকে নয়। কারণ জাতির মুক্তি বাদ দিয়ে মানবজাতির কলুষতা দূর করা একটা নিরর্থক চেষ্টা। এটা মনের কথা—বিজ্ঞানীর কথা নয়।

যদি আমরা ভেবে থাকি সহজ ও বাধাহীনভাবে নারী পুরুষের সঙ্গে অবাধ মিলিত হতে পারবে—ভ্রূণ হত্যা করা চলবে, মাতৃসদনে যেতে পারবে শিশুসদনে তার গর্ভস্থ সন্তানকে রাখতে পারবে ও Kinder garten এবং তার সন্তান খেলা করবে—এসব করলে নারীর প্রতি কর্তব্য পালন করা হল—তা নিছক মূর্খামী।

শ্রীকান্তের চোখে কমললতার মূল্য কি? এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ জবাব শরৎচন্দ্র দেননি। এবং দেননি বলেই কমললতা শরৎ-সাহিত্যের 'সিল্যুট্'। কালস্রোতে শরৎ-সাহিত্যে ভেসে গেলেই অক্ষয় অমর হয়ে থাকবে— শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বের নারী বোষ্টমী

কমললতা। কালের কপোলতলে শুভ্র-সমুজ্জ্বলা কমলতার জীবন দর্শন যৌবন ও আত্মবিশ্বাস হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটাহীন ও ইন্দ্রধনু-চ্ছটাশূণ্য—তবু নব নব পাঠক ও সমালোচকদের কাছে সে সন্ধ্যা-রক্তরাগসম এক 'দ্যুতি' যা শ্রীকান্তের মেলোনকলিয়ার সকরুণ আকাশকে চিরন্তন করে রাখবে।

বাল্যকালে জ্যামিতি পাঠ নিতে গিয়ে জেনেছিলাম—দু'টি সমান্তরাল রেখা কখনো এক সঙ্গে মিলতে পারে না। পরবর্তীকালে কোন গণিতজ্ঞ বলেছিলেন—হ্যাঁ—এমন একটা স্থানে উভয়ের মিলন ঘটেই।

শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্নের কমল আর শ্রীকান্ত চতুর্থপর্বের কমল-লতার মধ্যে আস্‌মান্ জমীনে ফারাক্। তবু বহুদূরদূরান্তে অপস্রিয়-মান দুটি চরিত্রের মধ্যে একটা মিল পাওয়া যায়—সেটা শরৎচন্দ্র পেয়েছেন—শরৎচন্দ্র পেলেই শ্রীকান্ত পাবে। সেই মিলটুকু যেন—যখন সমাজনীতি-রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মনীতির মিলিত ক্ষুব্ধ ঝড় বিদায় গোধুলিতে ধূমল হয়ে ওঠে, তখন কমললতা ও কমল হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে দিনান্তে নিশান্তে পথপ্রান্তে এদের ফেলে যাওয়া চলে না—ক্লান্ত সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাস ভরা বাতাসে ভাষার-অতীত তাদের পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলীর লাবণ্য সুরভি ভেসে আসে। শরৎচন্দ্রের (শ্রীকান্তের) কাঙ্গাল নয়ন তা ভুলতে পারেনি। এখানেই কমলতা ও কমল হল 'মিস্টিক্'।

শ্রীকান্ত তো কমলতাকে নিয়ে রস-ব্যঙ্গ ও অবসর বিনোদনের একটি বস্তু সামগ্রী করতে চেয়ে নিজেই ধরা পড়ে গেল ঐ নারীর প্রেমের করুণ কোমলতার কাছে। এবং শরৎচন্দ্র সেখানে বাক্যহারা।

আমি শেষ প্রশ্নের কমলকে এখন টানছিনা। আমি বুঝতে চাই শ্রীকান্ত কমলতাকে কী চোখে দেখেছিল? কমললতাকে তো

শরৎচন্দ্রের কাছে চিরমৌনজাল নয়। চতুর্থপর্বে রাজলক্ষ্মীও কমললতা— এই দুই নারী অন্তঃশীলা নদীর মত নীরব নীরে বয়ে গেছে শ্রীকান্তের দুই ধার দিয়ে। কিন্তু কমললতা তাকে ছেড়ে চলে গেছে যে ভাবে যায় বা গেছে কত নর-নারী—গেছে অনন্তের সন্ধানে। তাই সে জ্যোতির্ময়ী—তার আলোকের বর্ণে বর্ণে—শ্রীকান্তের নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়ন উদ্ভাসিত হয়েছে। কেন হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন শরৎচন্দ্র—তাঁর 'নারীর মূল্য' গ্রন্থে। গ্রন্থ হিসেবে নারীর মূল্য 'অক্ষয় বট' নয় এবং এখানে লেখকের বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারার সুসমন্বয় ঘটেনি। তবু অমরকথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের নারী-দরদী অন্তর শুভ্রকমলের মত ফুটে উঠেছে। সেটাই যথেষ্ট। কারণ অন্তর না থাকলে সাহিত্যিক ও সাহিত্যের মূল্য কিছুই নয়। তাই তো বিশ্বের অলিতে গলিতে বুদ্ধদেব বসু, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অবধূত তো অনেক জন্মাবেন—কিন্তু শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্র-নাথ, রোঁলা, টলস্টয়, 'শ, ডিকেন্স থেকে শুরু করে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, তারাশঙ্কর পাওয়া ভার।

শরৎসাহিত্যে দেখি শরৎচন্দ্র সমস্ত নারী চরিত্রের প্রতি অকৃপণ দরদ দেখিয়েছেন। তিনি তাদেরকে সমাজের পটভূমিকায় অনেক সময় রাখতে অক্ষম হয়ে কাশী আর বৃন্দাবনে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু একমাত্র কমললতাই লেখককে দরদ দেখিয়ে লেখককে ধন্য করেছে। তার বৃন্দাবন পথযাত্রা—লেখক জোর করে করাতে পারেন নি—এটা তো সত্য-সুন্দর পথতীর্থযাত্রা।

বিশ্বের যে যে মহান ব্যক্তি নারীর প্রতি বক্রোক্তি করেছেন—শরৎচন্দ্র তাঁদেরকে আক্রমণ করেছেন। আমি তাঁর 'নারীর মূল্য' গ্রন্থ থেকে কিছু উদাহরণ দিচ্ছি।

১) ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, 'নরকের দ্বার নারী।'

২) বাইবেল বলিয়াছেন, root of all evil অর্থাৎ সমস্ত অহিতের মূল।

৩) ইউরোপ-প্রসিদ্ধ লাটিন ধর্ম্মযাজক টারটুলিয়ান নারীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—Theu art the devil's gate, the betryer of the tone the first deserter of the divine law.

৪) ধর্মযাজক সেণ্ট অগষ্টিন, যিনি সেণ্ট পদবী পাইয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে শিখাইতেছেন, What does it matter whether it be in person of mother or sister; we have to be beware of eve in every woman."

৫) সেণ্ট অ্যাম্‌ব্রোস্‌—ইনিও 'সেণ্ট—তর্ক করিয়া গিয়াছেন, Remember that God took a rib out of Adam's body not a part of his soul to make her.

৬) ৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আহূত ওসিয়ায় ক্রীশ্চান-ধর্ম্ম-সঙ্গে নাকি স্থির হইয়াছিল, স্ত্রীলোকের আত্মা নাই।

৭) মধ্যযুগের সেণ্ট বার্ণার্ড (ইনিও সেণ্ট) জননীর উদ্দেশ্যে পত্র লিখিয়াছেন, What have I to do with you? what have I received from you but sin and misery? Is it not enough for you that you have brought me into this miserable world, that you being sinners have begotten me in sin..."

নারী সন্তান ধারণে অযোগ্য হলে, নারী পুরুষের যৌন তৃপ্তি দিতে অপারগ হলে, নারী স্বামীর নির্দেশে ব্যাভিচারিণী না হলে—সে নারী নয়। এ তথ্য সর্বাগ্রে প্রকাশ করতে চেয়ে শরৎচন্দ্র নারীর মূল্য' গ্রন্থে মানবেতিহাসের সমাজ-ব্যবস্থার উপর কড়া চাবুক হাঁকান। কথাটা ঠিক। নারীর মূল্যায়ণ ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে আজও পর্যন্ত হ'ল না। নারীর মধ্যে শুধু 'Sin' বস্তুটির সন্ধান করে গেছেন। তাই পুরুষের মধ্যে কু-প্রবৃত্তির কালোয়াতি চলছে। তাই তো বিবেকানন্দ এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে সীতা ও সারদাদেবীকে

সমাজে চিরারাধ্যা দেবী করে সমগ্র নারীজাতিকে সম্মান দেখিয়েছেন। এবং শরৎচন্দ্র হয়েচেন নারী দরদী।

যৌন তৃপ্তিদান অথবা গর্ভধারণ বা পরকীয়া প্রেমে ব্রতী হওয়াই যে নারীর একমাত্র মূল্য তা অস্বীকার করেছেন শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে। তার সামগ্রীক্ স্বরূপতা বিস্তার লাভ করেছে আমাদের পূর্ব-আলোচ্য কমললতার মধ্যে। কমললতা যেন নিদাঘের পাটলি পরাগসুরভি স্নিগ্ধ বন বাতাস পূর্ণ এক স্নিগ্ধ ছায়া। একটা অমলিন-পূর্ণাবয়বতার মাঝে মানস-পদ্ম সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

দুই

শরৎচন্দ্রের ও কমললতার প্রেম

শরৎসাহিত্যে প্রেম নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে সবাই একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে নিজেদেরকে আচ্ছন্ন রেখেছেন। কিন্তু এই অমর কথা শিল্পীর সাহিত্যে 'প্রেম' বস্তুটি বিশেষ বাগ বিতণ্ডার সৃষ্টি করে থাকে। 'প্রেম' কে নিয়ে সংকীর্ণতার গণ্ডী ছাড়াবার জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু সংকীর্ণোত্তর হতে পারে নি। তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ কমললতা। কমললতার প্রেম কেন শরৎসাহিত্যের নর-নারীর প্রেম যেন ব্রহ্মচর্যের মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হয়েছে—ডনজুয়াণীয় যৌন-স্বেচ্ছাচারিতা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায় নি। অবশ্য দেনাপাওনার জীবানন্দ আর চরিত্রহীনের কিরণময়ীর মধ্যে যৌন-প্রেম-কামনা যথেচ্ছার হয়ে দেখা দিয়েছে। অন্যত্র প্রেম শুদ্ধ-নির্মল-পবিত্র। এর কারণ শরৎচন্দ্র এ-দিকটাতে প্রচণ্ডভাবে গোঁড়া ছিলেন—এবং অসংমীয় প্রেম তাঁর কাছে neceessary evil রূপে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এটা না হতেও পারে তো। কারণ শরৎচন্দ্র সাহিত্যের খাতিরে হোক অথবা জীবনের আনন্দের জন্যই হোক—চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারী হয়ে প্রচুর ও অখণ্ড অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতায় তিনি হয়তো আত্ম বিশ্লেষণ করে দেখতে চেয়েছেন—কুন্দশুভ্রনগ্নকান্তি প্রেম এক অনিন্দ্যণীয় আনন্দের সঞ্চার করে—ডনজুয়ানী প্রেম বা কৃষ্ণের শত সহস্র গোপিনীদের সঙ্গে সম্ভোগ একটা উৎকট ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নয়। সেটার বিদ্যুৎলাঞ্ছিত উদাহরণ কমললতা। কমললতার প্রেমের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তার মধ্যে পাই positive health of body and mind. তার মধ্যে কোন negative নেই। অবশ্য

তিনি মনুসংহিতার বা গান্ধীজীর যৌন-মিলন ও প্রেম বস্তুকে গ্রহণ যোগ্য বলে স্বীকার করেন নি।

কিন্তু তাঁর কমললতা অন্যান্য নর-নারীর মতোই বলতে চেয়েছে তোমারে ভালবেসেছি যুগে যুগে অনিবার। শরৎচন্দ্রের কমলতা ফ্রয়েড বা গান্ধীজী তত্ত্ব গ্রহণ করে নি। কারণ—"আমাদের এই অনুন্নত—অতএব পিছিয়ে পড়া দেশে ব্রহ্মচর্যের আদর্শটা আজও মহান আদর্শ বলে স্বীকৃত। এর মস্ত বড় নিদর্শণ হলেন গান্ধীজী। তিনি অবশ্য পাঁজি দেখে দিনক্ষণ মিলিয়ে মৈথুন করবার নির্দেশ দেন নি; কিন্তু পৃথিবীর আর কোনো দেশে বিংশ শতাব্দীর আর কোন নেতা গান্ধীজীর মতো ব্রহ্মচর্যের আদর্শ নিয়ে উচ্ছ্বাস করতে পারেন, বা খুঁটিনাটির ব্যবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেন, এ-কথা প্রায় কল্পনার অতীত। এমন কি, স্বামী-স্ত্রীর জীবন থেকেও যৌন-মিলনের আদর্শকে কি ভাবে কতখানি বর্জন করা দরকার এ-নিয়েও মহাত্মার উপদেশ আজকের পৃথিবীতে এক অপরূপ বিস্ময়।" আবার এই নায়িকা নিশ্চিতভাবে যৌন আনন্দকেই জীবনের একমাত্র চরম করে তোলেনি।

এখানেই শরৎচন্দ্রের মুন্সীয়ানা। প্রেম-বস্তুটি জয়দেবের 'মঞ্জুল বঞ্জুল কুঞ্জ গীত' করে শ্লিষ্যতি, কামপি, চুম্বতি কামপি, কামপি রময়তি রামাম্ এর মতো অশ্লীল কাজ করতে নারাজ। অথবা আজ কালকার ফরাসী, ইতালীয় ও আমেরিক্যান নভেলিষ্টদের মতো প্রেমকে যৌনকূপের মধ্যে ফেলে চরিত্রগুলির সাইকো-অ্যানা-লেসিস্ও করতে চান নি। তাঁর কমললতা ভালবাসার গগনে প্রেমচন্দ্র। একটা image। তার কারণ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র প্রেমকে দর্পণ রূপে স্বীকার করেছেন। এবং এই প্রেম-দর্পণে চাওয়া-পাওয়া, কামনা-বাসনা সুন্দর ভাবে দেখা দেয়। এটাকে অনেকে নেতি বাচক আইডিয়ালিষ্ট বলে প্রচার করলেও তিনি মোটেই নেতিবাচক নন।

উপরন্তু realistic শরৎচন্দ্র তাঁর idealism কে ভ্রূক্ষেপ করেন নি। কদর্যতাকে সমাজ-সাহিত্যে তুলে ধরা বস্তুতান্ত্রিকতার পরিচয় নয়— আর 'প্রেম' তো instrumentalism নয়। টলস্টয়, গোর্কী, জোলা, ন্যুটহামসান্, ফক্নার, জেমস্ জয়েস্-মোরাভিয়া বা কেম্যু 'প্রেমকে' industrialisation করতে গিয়েছেন—বিশেষ করে সাত্রে ও মোরাভিয়া। শরৎচন্দ্র তাঁদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলেই—কমললতার স্বকীয়তা ফুটে ওঠে। এবং রোমারোঁলা বা টমাস হার্ডি বা অর্নেষ্ট হেমিংওয়ের নারী চরিত্রের 'মেলোনকলিয়া' নেই কমললতার মধ্যে— সেটা আছে 'গৃহদাহ'য়ের অচলা, 'শেষ প্রশ্ন'য়ের কমল বা চরিত্রহীনের সাবিত্রী ও শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মীর মধ্যে। শরৎচন্দ্র যে Pornography কে (নভোকবের 'ললিতা') প্রশ্রয় দিতে নারাজ—তেমনি তার নায়িকা কমললতা ব্রহ্মচর্যে, ত্যাগ ধর্মের, অবদমনের সাহায্য কীর্তন করবার জন্য খঞ্জনী বাজায় নি। মার্কসের মতোই কমলতা চায় এমন ব্যবস্থা যাতে সকলের জীবনে প্রাচুর্যে টলমল করে ওঠে। প্রেম-বিপ্লবের অগ্নিগর্ভ আহ্বানই তো এই হবে—বিদ্রোহী শরৎচন্দ্র তাই চেয়েছেন। কুসংস্কার-বাধা আঘাত ও অপবাদকে ভয় করে ত্যাগ ধর্মের পথে পাড়ি দিতে কমললতা নারাজ। কারণ বিধবা কমললতা যখন মন্মথের সঙ্গে অবৈধ প্রেমে (কমললতা একে মোটেই অবৈধ বলে মেনে নেয় নি) গর্ভবতী হ'ল—তখন যৌন জীবনের বেলাতে ব্রহ্মচর্যের কথাকে আমল দিতে রাজী নয়। শুধু তাই নয়— নর-নারীর প্রেমেও যৌন-সম্পর্ক হবে সুস্থ ও সহজ সম্পর্ক।

শরৎচন্দ্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন। তিনি রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির অবক্ষয়তাকে মালুম করেছেন। দেখেছেন এই বিশ্বযুদ্ধ মানুষকে দিয়ে গেছে হতাশা। সেখানে মেতারলিঙ্ক রচনা করলেন ব্লুবার্ড। রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে এলো 'ডাকঘর'। তিনি বিশ্বাস বরলেন 'বেলা যে পড়ে এলো—জল্‌কে চল্।' আর তরুণ তরুণীরা ভাবলো—বিগত যুগের সব রকম সংস্কার তো

ধাপার মাঠে চলেছে—অতএব যৌনজীবনে কোন প্রকার বাচ বিচার থাকবে না।—শরৎচন্দ্র ও তাঁর কমললতা কিন্তু বিশ্বাস হারান নি। আগামীদিনের উদয়-সূর্যের প্রতীক্ষা থাকাই উচিত। এটাই সাহিত্য, সমাজ ও প্রেমের Dynamicism. এক্ষেত্রে মনে হয় শরৎচন্দ্রের উত্তরসূরী হলেন সমারসেট মম। নিয়মকে মানতে হবে—অবশ্য যে নিয়ম প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট। মাধ্যাকর্ষণশক্তিকে আমরা তুড়ি মারতে পারি না। নরনারীর প্রেমের মধ্যে যৌন মিলন অল্প-বিস্তর প্রাধান্য পাবেই। 'শ'র মত কেউ স্ত্রীর সঙ্গে চুক্তি করেন না—যৌনসম্পর্ক থাকবে না—এটা হয় পাগলামী বা একরকম বিকৃতি।

এখানে আমি দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'নিষিদ্ধ কথা আর নিষিদ্ধ দেশ' থেকে কিছু অংশ তুলে দিলাম।

"——মানুষ শেষ পর্যন্ত সামাজিক জীবই, শ্রেণীসমাজকে ভেঙ্গে শ্রেণীহীন সমাজের দিকে এগোতে চাইবার সময় সমাজকে অস্বীকার করবার কথা তো ওঠেই না, বরং সমাজের উপর ঝোঁকটা অনেক বেশি করে পড়বার কথা। কেননা, শ্রেণীসমাজের মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হতে পারে, থাকতে পারে শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজের দিকে মানুষ যতই এগোতে চায় ততই সে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতরভাবে বুঝতে পারে দশের উন্নতি বাদ দিয়ে একের উন্নতি সম্ভবই নয়, দশের সুখকে বাদ দিয়ে কেউই একা সুখী হতে পারে না। জীবনের প্রত্যেক দিকের বেলাতেই এই কথা: তাই যৌন জীবনের বেলাতেও। অবশ্যই মানুষ কাম-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করে প্রকাশ্যভাবে নয়, প্রকটভাবে সমাজকে দেখিয়ে নয়। তবুও এই কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থতায় সামাজিক দিকগুলিকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। কেননা, প্রথমত, কোনো সুস্থ মানুষই আত্মরতিতে মগ্ন থাকতে পারে না; আত্মরতি পরায়ণ হয় তাহলে তাকে উন্মাদই বলতে হবে। অর্থাৎ মানুষের

স্বাভাবিক কামপ্রবৃত্তি অপর কোনো পাত্র বা পাত্রীকে চাইতে বাধ্য,—সমাজের অপর ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে তাই কারুরই যৌন জীবন সুস্থ ও সার্থক হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, কাম প্রবৃত্তির চরিতার্থতার সহজ ও স্বাভাবিক পরিণাম হলো সন্তানের জন্ম; এবং এই সন্তানজন্মের দিক থেকে ভেবে দেখলে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় সামাজিক ভালোমন্দের সঙ্গে কামপ্রবৃত্তি কী রকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত। আর এই দিক থেকে, সামাজিক ভালোমন্দের সঙ্গে যৌনপ্রবৃত্তির সম্পর্কের দিক থেকে—মানতেই হবে যৌনজীবনে মানুষ সব রকম বিচারবিবেচনাকে ঠেলে ফেলে বেপরোয়ার মতো শুধু ফুর্তির তালে ঘুরতেই পারে না। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, সোবিয়েৎ সমাজেও মানুষের আনন্দকে খর্ব করা হচ্ছে, নীতিমূলক বা কর্তব্যমূলক কয়েকটি বিধি নিষেধ দিয়ে। সমাজে সামাজিক ভালোমন্দের সঙ্গে যৌনজীবনের সঙ্গতি রক্ষা করার আসল তাগিদ হলো মানুষের আনন্দেরই তাগিদ। যৌনজীবনের উদ্দেশ্যটা কী। সুস্থ উপভোগ, পূর্ণাঙ্গ আনন্দ; সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি তাই হয় তাহলে ভালো করে ভেবে দেখা দরকার আনন্দ ও উপভোগ সবচেয়ে সুস্থ আর সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ কেমন করে হতে পারে? দশের সুখের সঙ্গে নিজের সুখের অধিকারী হতে পারেনা। আর তাই, তার যৌনজীবনেও দশের কথাটা, সমাজের কথাঠা, সে ঠেলে রাখতে পারে না—কোনো কল্পিত নীতিকথার খাতিরে নয়, কোনো ধর্মমূলক কর্তব্যবুদ্ধির তাগিদে নয়, শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ সুখের তাগিদেই। সোবিয়েৎ পরিকল্পনায় তাই সামাজিক দিকটার উপর এত বেশি ঝোঁক।

তারপর ব্যক্তিগত দিকটার কথাও ধরা যাক। যৌনপ্রবৃত্তির মূল নিয়মটা ঠিক কি? নির্বিচারে বহুকে উপভোগ করবার চেষ্টায় দৌড়নো? নিশ্চয়ই নয়; কেননা ওটা একরকম অসুস্থতাই।

প্রেম যেখানে সুস্থ আর সহজ সেখানে আস্ফালনের উৎসাহটা

নেই ; কিন্তু প্রেম যেখানে অসুস্থ আর পঙ্গু সেইখানেই আস্ফালনের আবরণ দিয়ে দুর্বলতা ঢেকে রাখবার দরকার পড়ে। তাই এই আস্ফালন, এই বেপরোয়া ব্যবহারের তাগিদ,—এর মধ্যে আনন্দের আস্বাদ জোটাবার সম্ভাবনা নেই। প্রেম যেন এই ক্ষেত্রে একটা উত্তেজক ওষুধ, যেন মাদক দ্রব্য, মাতালের কাছে যেমন মদ। এই ওষুধ, এই মাদক দ্রব্যের কাছ থেকে উত্তেজনা না পেলে মন যেন অসহায় বোধ করে, নেতিয়ে পড়তে চায়। যাদের আমরা মাতাল বলি, মগুপান তাদের কাছে সুস্থ উপভোগ নয়, তার বদলে একরকমের বাধ্যতামূলক দাসত্ব। তাই মদ না পেলে এরা হন্যে হয়ে ওঠে, জীবনের আর কোনো অর্থই এরা খুঁজে পায় না। মদের অভাব এদের সত্তাকে টলিয়ে দিতে চায়, পঙ্গু অকর্মণ্য করে রাখে।

মগুপানের বেলায় যে কথা, প্রেমের বেলাতেও সেই কথা। প্রেমের পেছনেও শুধু সহজ প্রবৃত্তির তাগিদ থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে, থাকতে পারে একরকম অসুস্থ ও বাধ্যতামূলক তাগিদ। যে প্রেমের পেছনে সহজ প্রবৃত্তির তাগিদ, তাকেই বলতে হবে সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রেম। সেখানে কাঙালের ভাব ফুটে উঠবে না—কাঙালের খিদে আর সুস্থ মানুষের খিদে, এ-দু'এর মধ্যে জাতের তফাত আছে। পেট ভরলেও কাঙালের খিদে চোকে না। প্রেমের তাগিদ যেখানে কাঙালপনার রূপ নিয়েছে, মাতলামির রূপ নিয়েছে, সেখানে প্রেমিকের মনের পেছনে সহজ প্রবৃত্তির সুস্থ তাগিদ নেই, আছে অসুস্থতার তাগিদ। তাই প্রেমিক এখানে প্রেমিকাকে চায় না, প্রেম চায় না, চায় মাত্র প্রেমিকার সংখ্যা। কাঙালের যেমন খাবারের দিকে মন থাকে না, থাকে পরিমাপটার দিকে। প্রেম যেন মার কাছে একরকম চিকিৎসাপদ্ধতি, অসুস্থ এক মনোভাবের চিকিৎসা। প্রেম যেখানে সহজ ও সুস্থ প্রেমিকের মনে সেখানে শক্তির সচ্ছলতা ; আর তাই, এই সচ্ছলতার নির্ভরেই তার মন বহুমুখী আনন্দের,

বহুমুখী সৃজনীর পথে এগোতে পারে। কিন্তু শুধু হন্যের মত নারী অন্বেষণে যার মন আটকে রয়েছে, নারী তার কাছে হলো জীবনের একমাত্র অবলম্বন, মাতালের কাছে যেমন মদ, কোকেন-সেবীর কাছে যেমন কোকেন। তার মনের শক্তি এত ক্ষীণ, এমন দুর্বল যে, এই অবলম্বনকে বাদ দিয়ে সে যেন বাঁচতেই পারে না। তার মনের আসল রূপটা তাই রুগ্ন, দৈন্যের রূপ, অভাবের রূপ, করুণ ও অসহায়। তার প্রেমকে তাই প্রেমই বলা চলে না—বরং কাঙালের খিদের মতো এ-প্রেম একরকম অসুস্থতা।

যে-যুবকদল প্রেমকে এমন তথাকথিত সোজা ব্যাপারে পরিণত করে তোলবার আস্ফালন করছে, তারা আসলে জীবনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত এক অসুস্থ আদর্শ নিয়েই বড়াই করছে। তাই ব্যক্তিগত আনন্দের দিক থেকেও, এই 'এক গ্লাস জল' মার্কা মতবাদকে উৎসাহ দেবার কিছু নেই। এটা যৌনমুক্তির কথা নয়, পঙ্গু মনোভাবের কথা। তাছাড়া, সামাজিক দিক থেকে তো যৌনমুক্তি বলতে বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতা বোঝাতে পারেই না।

আগের এক অধ্যায়ে বলেছি—শরৎচন্দ্রের প্রেম নিকষিত হেম—কামগন্ধ নাহি তায়। এখন প্রশ্ন ওঠে যে তিনি কি এমন প্রেমের ছবি এঁকেছেন—যাকে আমরা Platonic love বলতে পারি। হ্যাঁ তাঁর প্রায় সব চরিত্রের মধ্যে এই moral love এর সন্ধান মেলে—সন্ধান মেলে কমললতার মধ্যে।

হার্ডির টেস্, ফ্লবেয়রের মাদাম বোভারী আর টলষ্টয়ের আনাকারেনিনার যে প্রেম—তাতো তাদের মহা ট্রাজেডীর দিকে টেনে নিয়ে গেছে। নিশীথ রজনীতে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ অসীম সিন্ধুর কোলে এ্যালবাট্রসের ক্রন্দন যেন। বাংলা ঔপন্যাসিকদের Modernism এর গণ্ড দেশে চড় মেরে রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি' সৃষ্টি করলেন—এবং বাংলা উপন্যাসরাষ্ট্রের সাগর সোপান 'চোখের বালি'। এর বিনোদিনীও কিন্তু প্রেমের জৈবিক ক্ষুধা থেকে বঞ্চিত

৩

নয়। অর্থাৎ টলস্টয় বলুন, রবীন্দ্রনাথ বলুন সবাই নারীকে নারীই দেখেছেন। আর শরৎচন্দ্র নারীকে সুন্দরী শুকতারা দেখেও তার মানবিক দিকটাও ফুটিয়ে তুলেছেন।

কমললতা বিবাহিত জীবনে স্বামীকে ভালবাসতো। বিধবা কমললতা মন্মথকে প্রচণ্ড ভালবাসতো। বোষ্ঠমী কমললতা কবি গহরকেও ভালবাসতো। আবার শ্রীকান্তও তার ভালবাসার বস্তু। এই ভালবাসার মধ্যে সে কিন্তু নিজেকে বঞ্চিত করেছে, অন্যকে করে নি। তার প্রেম—উর্দ্ধ গগণে বিশান বাজায় নি—কিন্তু বসন্ত রাতের কোকিলের কুহুতান তুলেছে। যেমন ধরা যাক্ কবি গহর ও কমললতা।

গহর কবি হলেও জাতে মুসলমান। কমললতার প্রতি সে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট ছিল। কমললতা গহরকে মুসলমান বলে দূরে সরিয়ে দেয় নি—তাকে আখড়ায় আহ্বান জানিয়েছে।

সে তার মোহিনী মায়ায় গহরকে ভোলাবার চেষ্টা করেনি। তার প্রাপ্য ভালবাসা দিয়েছে। আবার মৃত্যু পথযাত্রী গহরকে সে সব লোকলজ্জা ভয়কে পদদলিত করে সেবা করেছে—তাতে প্রমাণ হয় কোন কিছু পাবার জন্য সে গহরকে ভালবাসেনি—গহর ভালবাসার মানুষ বলেই তাকে ভালবেসেছে। এই গহরের জন্যই কমললতাকে মুরারীপুরের আখড়া ছাড়তে হ'ল। প্রধান মহান্ত অর্থাৎ গুরুদেব এই নারীর মানবিক দিকটা দেখলো না—এখানেই বৈষ্ণববাদের চূড়ান্ত অবনতি। কিন্তু কমললতার কাছে এই বৈষ্ণববাদ নতুন রূপ পেল। সে বঞ্চিত হল অনেক কিছু থেকে—কিন্তু লাভ করলো পরম-সত্যকে। এখানেই কমললতার প্রেম হ'ল love of truth,

তিন

কমললতা

বাহির হতে দেখ না আমায় এমন করে।

শুধু সঙ্গীত নয়—এক সাধারণ অবহেলিতা নারীর মূক বাণী যেন এটা। এবং এই নারী হল শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বের এক নারী চরিত্র —নাম তার কমললতা। পূর্বনাম উষাঙ্গিনী। এখন তার নাম কমললতা—মুরারীপুর আখড়ার বৈষ্ণবী। এবং নবীন প্রভৃতি গ্রামবাসীদের কাছে সে মায়াবী—এই লাস্যময়ী বৈষ্ণবের যৌবন শিখায় ভস্মীভূত হয়েছে অনেকে। অতএব কমলতা কোনমতে একটি আলোচ্য চরিত্র নয়। সে-উপগ্রহ মাত্র। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের যে কয়টি নারী, অন্নদাদি, অজয়া ও সুনন্দা আমাদের কাছে সরোবরের সুন্দর শতদলের মত প্রস্ফুটিত হয়ে আছে—সেখানে কমললতা নৈব নৈব চ। আর রাজলক্ষ্মী—সে তো শ্রীকান্তের বহুদূর বিস্তৃত জীবন কথা পথের মধ্যাকর্ষণ শক্তি। অতএব কমললতা তো শ্রীকান্ত নামক বহু প্রশংসিত চারখণ্ড পুস্তকের মধ্যে একটি সামান্য চরিত্র মাত্র। তাকে নিয়ে আলোচনার কি আছে? সমালোচকরা যাই বলুন-পাঠক পাঠিকাদের কথা এহো বাহ্য।

কমললতা শরৎচন্দ্রের একটি বিশেষ সৃষ্টি। হয়তো জগতের মাঝে সে বিচিত্র ব্যক্তি নয়—তার রূপলাবণ্য রাজলক্ষ্মীর কাছে ম্লান। তবু কমললতার চরিত্র আঁকতে গিয়ে শরৎচন্দ্র যেন নিজের অজ্ঞাতসারে একটা বিশেষ মতাদর্শকে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন—যা ভবঘুরে ও ধর্ম-উদাসীন শ্রীকান্ত অতি সন্তর্পণে তা স্বীকার করেছে। কমললতা শরৎ সাহিত্যেরআর আর নারীচরিত্রের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। রাজলক্ষ্মী, রমা, অন্নদাদি, বিজয়া, সাবিত্রী, কিরণময়ী থেকে শুরু

করে অচলা বা বন্দনা পর্যন্ত সবাই শরৎ লেখনীর ক্রীড়নক মাত্র। তারা কেহ সমাজ ও তাদের ধর্মকে অগ্রাহ্য করতে পারেনি। তারা সতী আবার কখনো নারী। কিন্তু কমললতা এদের থেকে পৃথক। সে ছায়াপথ নয়। একটি বিশেষ নক্ষত্র। শত কোটি যোজন থেকে তার মহিমা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কিসের মহিমা? সেটাই আলোচনা করতে বসেছি।

কমললতার চালচলন ও কথাবার্তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বৈষ্ণব ধর্মবাদ। কিন্তু তার চিন্তা ও কর্মবাদের মধ্যে পাওয়া যায় একাধারে বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও সুফীবাদ। কমললতার জীবন মাধুর্য উছলে উছলে উঠে থাকে এক অভাবনীয় অদৃশ্য দেবতার বিপুল আকর্ষণে—সেখানে তার চরিত্র-জীবন উদয়সূর্যের রক্তিম আভায় বিচ্ছুরিত; আবার শেষ প্রান্তে দেখি অস্তরবির স্বর্ণ ছটায় দ্যুতিময়। এ-যেন কোন শক্তিশালী শিল্পীর নিপুন তুলিকায় আঁকা সে।

কমললতা—একে ধনি একাকিনী দোসর নাহি ওগো সঙ্গ'—এবং জীবনদর্শনাবগুণ্ঠন মোচন করবার জন্য নিশীথ রজনীর বর্ষণমুখর পিচ্ছিল পঙ্কাবৃত পথ ধরে সজনির আহ্বানে চলেছে। কেন চলেছে সেই উত্তর সেই আনন্দ—সেই বেদনা উপলব্ধি করবার জন্য আমরা উন্মুখ নয়নে তার দিকে অবলোকন করে আছি এবং দেখলাম শ্রীকান্ত তাঁকে সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সাঁইথিয়া রেল ষ্টেশনে নেমেছে। আর কমললতা হয়েছে বৃন্দাবন পথ যাত্রী।

শ্রীকান্তের সঙ্গে কমললতার সাক্ষাৎ ও শেষে বৃন্দাবনে যাত্রা—এই ঘটনার মধ্যে আমরা পেয়েছি—কমললতা তার প্রখর আত্মসম্মান ও একটা স্বতন্ত্রমতবাদের উপর ভিত্তি করে সর্বস্বত্যাগ করে গোপীজন-বল্লভ কৃষ্ণের মোহন বাঁশীর আহ্বান শুনে চলেছে। আর শ্রীকান্ত ভাব-বিহ্বল। ভবঘুরে বাউণ্ডুলে ছন্নছাড়া শ্রীকান্ত কিন্তু লাট্টুর মত পাক্ খাচ্ছে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের চারটে খণ্ডতে। এই লাট্টুর লেত্তিখানা হাতে নিয়েছে নিয়তি; ইংরাজীতে যাকে বলি Tragedy

এবং গ্রীকদের ভাষায় Fate। এই Fate বা নিয়তি শ্রীকান্তকে ক্রীড়ণক করেছে—তাই ম্যালেরিয়ায় ভরা বাংলা দেশের বিজন পল্লী, বিহার, উত্তর প্রদেশ থেকে সুদূর ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত ঘূড়িয়ে ঘূড়িয়ে মারছে—শ্রীকান্তকে কোথাও সুস্থির হতে দেয় না। কিন্তু এই Fate তাকে শততরঙ্গে ভাসিয়ে দেয় নি। শ্রীকান্তকে যে ঘুড়ির মত উড়িয়েছে—সে হল রাজলক্ষ্মী—যার আর একনাম পিয়ারীবাঈ। যেন তুলসী তিল দিয়ে এই নায়ক রাজলক্ষ্মীর হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছে—রাজলক্ষ্মীর হাতে ঘুড়ির লাটাই। সেই ওড়াচ্ছে এই ভবঘুরে যুবককে আবার নিজের ইচ্ছা মত নিজের কাছে এনে রাখছে—আদর করছে—আবার আকাশে উড়িয়ে দিচ্ছে।

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে শ্রীকান্ত যেন আউল, বাউল গোছের কোন যুবক। হাল ছেড়ে বসে আছে সে—মন নেই কিছুতেই। কিন্তু যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তলিয়ে দেখি তা হলে শ্রীকান্ত যেন কোন এক অদৃশ্যশক্তির প্রেরণায় এক বিশেষ কিছু পাবার আশায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাই সে পাঠকের চোখে Object হয়ে আছে। Subject এখানে রাজলক্ষ্মী। তাই শরৎচন্দ্রের যে অভিমত 'শ্রীকান্ত' ভ্রমণ কাহিনী তা মানতে রাজী নই। উপন্যাস তাতেও সন্দেহ! তা হলে কি? নভেল! না—শ্রীকান্ত হল কতকগুলি চরিত্রের প্রকাশ এবং এই প্রকাশের মধ্যে দিয়ে শ্রীকান্ত প্রস্ফুটিত হয়েছে। অর্থাৎ চরিত্রগুলি তার দেহে, মুখে ও মনে আলো ফেলে তাকে প্রকাশ করেছে।

এই চরিত্রগুলির মধ্যে কমললতা একজন।

কমললতা হ'ল শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বের এক প্রধান চরিত্র। এই নারী চরিত্রই এই পর্বে বাকী তিন পর্বের সর্বপ্রধানা ও চিরআকাংখিতা চরিত্র রাজলক্ষ্মীকে বেশী মাত্রায় ম্লান করে দিয়েছে। এ-কাজটা শরৎচন্দ্র যেন অতি নিভৃতে ও অতি সংযত ভাবে করেছেন—যাতে রাজলক্ষ্মী কেন পাঠকবর্গও যাতে ধরতে না পারে।

কমললতার সঙ্গে শ্রীকান্তের প্রথম সাক্ষাৎ অতর্কিতে আবার অতাকতে নয়। অর্থাৎ এসেছিলে তবু আসো নাই' এ-ভাবে। শ্রীকান্তের বাল্যবন্ধু কবি গহর স্বল্প শিক্ষিত গ্রাম্য মুসলমান ও একটু অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। গহর বাল্যকাল থেকেই কবিতা লিখে সবাইকে শোনাতো। তার স্বভাব আপন ভোলা ও উদার। ধর্মের গ্লানি তাকে স্পর্শ করেনি। ছাত্রাবস্থায় গহরের মাতার স্নেহ ও ভালবাসা শ্রীকান্ত লাভ করেছিল। এবং বহুদিন পর রেলস্টেশনে বহুদিনের বন্ধু গহরের সঙ্গে পরিচয়। গহর তাকে জোর করে তার বাড়ীতে আনে। অনেক কথার মধ্যে গহর নদীর পারে মুরারীপুরের বৈষ্ণব আখড়ার কথা বলে ও সেখানকার চন্দ্রচূড়া বৈষ্ণবী কমললতার সন্ধান দেয় ?

বোধ হয় দেয় নি। কারণ দ্বিতীয়বার যখন শ্রীকান্ত আবার গহরের সন্ধানে তার বাড়িতে এলো—তখন কবির সন্ধান পেল না।

"গহরের খোঁজে আসিয়া নবীনের সাক্ষাৎ মিলিল। সে আমাকে দেখিয়া খুশি হইল, কিন্তু মেজাজটা ভারী রুক্ষ; বলিল, দেখুন গে ঐ বোষ্টমীর বেটীদের আড্ডায়। কাল থেকে ত ঘরে আসা হয় নি। 'সেকি কথা নবীন! বোষ্টমী এলো আবার কোথা থেকে ?

একটা ? একপাল এসে জুটেছে।

কোথা থাকে তারা ?

ঐ ত মুরারীপুরের অখড়ায়।"

আবার দেখুন।

"আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তোমাব বাবু ত মুসলমান, বৈষ্ণব-বৈরাগীরা তাদের আখড়ায় ওকে থাকতে দেবে কেন ?

নবীন রাগ করিয়া কহিল, ঐ সব আউলে বাউলেগুলোর ধর্মাধর্ম জ্ঞান আছে নাকি ? ওরা জাত-জন্ম কিছুই মানে না,

যে কেউ ওদের সঙ্গে মিশলেই ওরা দলে টেনে নেয়, বাচবিচার করে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সেবার যখন তোমাদের এখানে ছ' সাতদিন ছিলাম তখন ত গহর ওদের কথা কিছুই বলে নি ?

নবীন বলিল, বললে যে কমললতার গুণাগুণ প্রকাশ হয়ে পড়ত।”

এবার শ্রীকান্ত নবীনের কাছে শোনে ‘আর কমললতা একজন যুবতী বৈষ্ণবী—এই আখড়াতেই বাস করে।” তারপর শ্রীকান্ত ‘কমললতা বৈষ্ণবীর আখড়ার উদ্দেশ্যে অপরাহ্ন বেলায় যাত্রা’ করে। সে নবীনের কাছে শুনেছিল, সেখানে একপাল বোষ্টমী আছে, এবং সকলের সেরা বোষ্টমী কমললতা আছে।’ আখড়ার বড় গোঁসাইয়ের আহ্বানে কমললতা সেখানে এসে উপস্থিত হল। গহরও ছিল। কারণ—”অনতিকাল পরেই গহর গোঁসাইয়ের সঙ্গে কমললতা আসিয়া উপস্থিত হইল। বয়স ত্রিশের বেশী নয়, শ্যামবর্ণ, আঁটসাট ছিপছিপে গড়ন, হাতে কয়েক গাছি চুড়ি—হয়ত পিতলের, সোনার হইতেও পারে, চুল ছোট নয়, গেরো দেওয়া পিঠের উপর ঝুলিতেছে, গলায় তুলসীর মালা, হাতে থলির মধ্যেও তুলসীর জপমালা।

অর্থাৎ শ্রীকান্তের নয়নে কমলতার সৌন্দর্য—নীচের কবিতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল না। হয়তো সে ভেবেছিল বোষ্টমী কমললতার রূপ—

“কি আরে নব যৌবন অভিরামা।
যত দেখল তত কহহি ন পারিয়
জয় অনুপম এক ঠামা॥
হরিণ ইন্দু অরবিন্দ করিণী হিম
পিক বুঝ অনুমানি॥
নয়ন বয়ন পরিমল গতি তনুরুচি
অও অতি সুললিত বাণী॥

কুচযুগ পর চিকুর ফুজি পসরল
তা আরু ঝাঁয়ল হারা ॥
জানি সুমেরু উপর মিলি উগল
চাঁদ বিহুন সবে তারা ॥
লোল কপোল ললিত মাল কুণ্ডল
অধরবিম্ব অধ খাই।
ভৌঁহ ভ্রমর-নাসাপুট সুন্দর
সে দেখি কীর লজাই ॥"

কিন্তু তা নয়। তা হোক—সে যতই কালো হোক শ্রীকান্ত তার কালো হরিণ চোখ দেখে বিহ্বল। তাছাড়া সে তো রাজলক্ষীর রূপ-সাগর সৌন্দর্য দেখে এত বিমুগ্ধ যে অন্য নারীর রূপ তার কাছে চন্দ্রের নিকট জোনাকি। কারণ রাজলক্ষীর সৌন্দর্য্য—সেখানে অনঙ্গ মদন মুর্ছিত ও অস্থির হয়ে পড়ে। কোটি মদনমথনকারী মাধবও সে-রূপ দেখে ধরণীতে পতিত হয়। কত কত লক্ষ্মীও বিভোর হয়ে তার চরণতলে পড়ে ভাবে তার পদপঙ্কজ দিবানিশি কোলে নিয়ে আগলাইয়া থাকে। অতএব আমরা বুঝি শ্রীকান্ত কদাচ কমললতাকে আফ্রেদিতি অর্থাৎ সিন্ধুসম্ভবার মত দেখবে না। তবু বোষ্টমী কমললতার রূপকে সে একে বারে অবহেলা করতে পারল না।—তার মনে অন্তঃসলিলার ফলগুর মতই কমললতার একটা বিশেষ সৌন্দর্য স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে এবং সে মনে মনে ভাবে এই বোষ্টমীকে কোথায় যেন দেখাদেখা মনে হচ্ছে—তার চালচলনও যেন চেনা।

হঠাৎ হঠাৎ দেখা পূর্বরাগও নয় বুঝি।

কমললতাও শ্রীকান্তকে দেখেই চিনতে পারল। যেন.কত কালের পরিচয়—কত দিনের সান্নিধ্য। তাই সে শ্রীকান্তকে প্রশ্ন করে, 'কি গোঁসাই, চিনতে পার?'

শ্রীকান্ত উত্তর দিল, 'না, কিন্তু কোথায় যেন দেখেচি মনে হচ্চে।'

কমললতা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, দেখেচ বৃন্দাবনে!'

শ্রীকান্ত কখনো বৃন্দাবনে যায় নি। কিন্তু কমললতা বলেছে, সেখানে সে গরু চরাতো ফল পেড়ে আনতো, বনফুলের মালা গেঁথে তাদের গলায় পরাতো। মনে হল কমললতা তাকে ঠাট্টা করছে। কিন্তু কমললতার হৃদয়-যমুনার গভীরে অবগাহন করলে বোঝা যাবে এ-ব্যঙ্গ বা ঠাট্টা বা কৌতুক নয়—এ যেন সম্পূর্ণ সত্য। কমললতার চোখে শ্রীকান্ত-যেন বৃন্দাবন সখা কৃষ্ণ—এবং শ্রীকান্তকে পাবার জন্য তার মনের অবস্থা নিম্নরূপ—

"কানু বদন হেবি উচ্ছলিত অন্তর
লাজে বসনে মুখ ঝাঁপ।
ঈষদ অবলোকনে ছল ছল লোচনে
কেলিক সমাগমে কাঁপ॥

এখানে দুটো কারণে কমললতা শ্রীকান্তের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। পাঠক আমার কথা শুনে যেন মর্মাহত হবেন না। 'শয়তানের আকর্ষণী শক্তি প্রবল'।

যে গহর দিনে একবারও কমললতার আখড়ায় না এসে থাকতে পারত না, সে শ্রীকান্তকে পেয়ে আখড়ার কথা বেমালুম ভুলে গেল। শুধু তাই নয় শ্রীকান্ত গহরের কাছ থেকে চলে যাবার পর গহর আখড়ায় ফিরে গিয়ে শ্রীকান্তের গল্পে মশ্‌গুল্ হল। এবং কমললতা ভাবল, এ কেমন ধারা লোক যে হিন্দু হয়ে মুসলমানের বাড়ি পাত্ পাড়লে। দ্বিতীয় কারণ—কমললতা বোষ্টমী সত্য। কিন্তু তার এক জীবন ছিল। সেটা পড়ে বলছি। এখন শুধু বলে রাখি, সে মাত্র সতেরো বছর বয়সে বিধবা হয়। তার স্বামীর নাম ছিল শ্রীকান্ত। এই জন্য এই নাম মুখে আনতে বাধা—তাই শ্রীকান্তকে নতুন গোঁসাই বলে ডাকা শুরু করে।

অতএব দু'টি কারণে সে শ্রীকান্তের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রথমটা হল তার নির্লীপ্তভাব ও উদাসী মনের জন্য। দ্বিতীয়টি তার মৃত

স্বামীর নাম শ্রীকান্ত। কিন্তু যেটা মুখ্য ও তৃতীয় কারণ—তা হল বোষ্টমী কমললতার বৈষ্ণব রস মাধুর্য যে নিঃসৃত হতে থাকে শ্রীকান্তের মন ও তনু থেকে। এখানে কমলতা 'Mystic'।

শ্রীমতী রাধিকার দশ দশার মতই কমললতার মধ্যে এই দশাগুলি প্রকটিত হয়ে ওঠে।

শ্রীকান্তকে প্রথম দর্শন মাত্রই কমললতার মন যেন নিদারুণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলতে চায় "কাল বলি কালা গেল মধুপুরে সে কালের কত বাকী! আর শ্রীকান্তের মনে হল—

প্রাণ-নন্দিনী রাধা বিনোদিনী
কোথা গিয়াছিলা তুমি।
এ গোপ নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিয়া ব্যাকুল আমি॥"

এবং এই মুহূর্তে শ্রীকান্তের দিকে তাকিয়ে Bernard Shaw-এর Pygmallion এর একটা কথা মনে হয়—"The constable shakes his head, reflecting on his own courtship and on the Vanity of human hopes. He moves off in the opposite direction with slow professional steps."

শ্রীকান্তের কমললতার দুইটি রূপ। দুই চরিত্র বললে ভুল বলা হয় না। একটা অতীত অন্যটি বর্তমান। আমরা বলতে পারি একটা Subjective, অন্যটি Objective. দুটো চরিত্রই শরৎচন্দ্রের দক্ষ লেখনীতে সূক্ষ্ম ভাবে ফুটে উঠেছে। এবং সেদিকে তাকিয়ে আমরা Walter Allen এর ভাষায় বলতে পারি, "Every novelist, then, gives us in his novels his own Porsonal, idiosyncratic vision of the world. The vision is acted out by images of men and women., It is, so to speak, Populated, and this is why we may quite legitimately talk about a novelist's 'world'. We mean by it the whole realm

of his imagination, as he has put it down on paper, and we mean further that this realm, fictitious though it is, is yet somehow a self—contained entity consistent in itself and conforming to the Psychological laws which govern its creator and his response to life." এখানে শরৎচন্দ্র লেখনীর অদ্বিতীয় কৃতিত্ব। তিনি কমললতাকে যতখানি সুস্থ-সৌন্দর্য ও সাহিত্য-রসসিক্ত করতে চাননি—তাঁর অবচেতন মন ঠিক ততখানি রস সম্রাজ্ঞী করেছে তাঁকে। সেখানে মানে শ্রীকান্তের চতুর্থপর্বে রাজলক্ষ্মীর চরিত্র অনেক হ্রাস পেয়েছে। শুধ্ শ্রীকান্তে নয়—সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে এই নারী সমস্যা হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ যাহা তিনি চেয়েছেন—তা ভুল করে চেয়েছেন—যাহা পেয়েছেন তা চাননি। এখানেই প্রকৃত ঔপন্যাসিকের মহিমা।

কমললতার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখি এক অভিনব সুন্দর সত্তা ফুটে উঠেচে বর্ষাস্নাত ভূ-কদলীর মত।

কমললতার তনু—বল্লরী রক্তমাংস-সৃষ্ট। রবির কিরণের মত রতির কিরণ জলেতে অর্থাৎ হৃদয়ে পতিত হয়ে শুষ্ক করে বিরহ-তাপে এবং তার গতি উর্দ্ধমুখীন্। এবং পুরুষ-প্রকৃতি উভয়ের এক রীতি—রতি-সাধন মগ্ন উভয়ের। এবং

"পুরুষেরি যুতে নায়িকার রীতে
যে মতে সংযোগ পায় ॥
পুরুষ-সিংহেতে পদ্মিণী নারীতে
সে সাধন উপজয়।

এবং এটা হল সোনায় সোহাগা। আমরা বলতে পারি—

"Such moving Sounds from such a careless touch,
So unconcern'd her selfe, and we so much!"

কমললতার আবির্ভাব ঘটে আমাদের কাছে এক Romantic

situation এর পরিপেক্ষিতে। কিন্তু তাঁর 'মিষ্টিক' জীবন যাত্রার দিকে তাকিয়ে বলতে হয়—

"সদা বল তত্ত্ব তত্ত্ব কত তত্ত্ব শুন।
চব্বিশ তত্ত্বে হয় দেহের গঠন ॥
পঞ্চভূত ক্ষেত্র তেজ মরুৎ ব্যোম আপ।
ষড়রিপু কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্য দম্ভ ॥
দশ ইন্দ্র শত তারা হয়ত পৃথক্।
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় বিবিধ নামাত্মক ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় জিহ্বা কর্ণ নাসা ত্বক্ চক্ষু।
কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্ত পদ গুহ্য লিঙ্গ বপু ॥
মহাভূত অহঙ্কার আর হয় জ্ঞান।
এই ত হয় চব্বিশ তত্ত্ব নিরাপণ ॥"

চব্বিশ তত্ত্ব নিয়ে যদি নারীর গঠন হয় তাহলে কমললতার মধ্যে সেটা নিশ্চিত আছে এবং কমললতার দুটো জীবনের এক অধ্যায় বারোতত্ত্ব এবং অন্য অধ্যায় বাকী বারো তত্ত্ব বর্তমান। দীপশিখা বেশী উজ্জ্বল হয়—যত তাকে উসকে দেয়া চলে—আর তারফলে 'পতঙ্গ দেখিয়া পড়য়ে ঘুরিয়া পুড়িয়া মরয়ে পাখা।'

আগেই বলেছি কমললতার দুই জীবন। এক উষাঙ্গিনী, দুই বোষ্টমী কমললতা।

প্রথম জীবনের যে সে কমললতা নয়—অন্য একজন।

শরৎচন্দ্রের ভাষায় বলি ঃ—

"—অন্যত্র যাইবার উপক্রম করিতেছি, কোথাও একটি লোক আড়ালে বসিয়াছিল, উঠিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথমটা আশ্চর্য্য হইলাম এ জায়গাতেও মানুষ থাকে। লোকটির বয়স হয়ত আমাদের মত—আবার বছর দশেকের বেশী হওয়া বিচিত্র নয়। খর্ব্বাকৃতি রোগা গড়ন, গায়ের রঙটা খুব কালো নয় বটে, কিন্তু মুখের নীচের দিকটা যেমন অস্বাভাবিক রকমের ছোট, চোখের ভ্রূ

ছুটাও তেমনি অস্বাভাবিক রকমের দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বিস্তীর্ণ বস্তুতঃ এত বড় ঘন মোটা ভুরু যে মানুষের হয় ইতিপূর্ব্বে এ জ্ঞান আমার ছিল না। দূর হইতে সন্দেহ হইয়াছিল, হয়ত প্রকৃতির কোন হাস্যকর খেয়ালে এক জোড়া মোটা গোঁফ ঠোঁটের বদলে লোকটার কপালে গজাইয়াছে। গলাজোড়া মোটা তুলসীর মালা, পোষাক-পরিচ্ছদও অনেকটা বৈষ্ণবদের মত, কিন্তু যেমন ময়লা তেমনি জীর্ণ।

মশাই!

থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, আজ্ঞা করুন।

আপনি এখানে কবে এসেচেন শুনতে পারি কি?

পারেন। এসেচি কাল বৈকালে।

রাত্রিতে আখড়াতে ছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ ছিলাম।

ওঃ;

মিনিট খানেক নীরবে কাটিল। পা বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লোকটা বলিল, আপনি ত বোষ্টম নয়, ভদ্রলোক—আখড়ার মধ্যে আপনাকে থাকতে দিলে যে?

বলিলাম, সে খবর তাঁরাই জানেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা করবেন!

ওঃ! কমললতা থাকতে বললে বুঝি?

হ্যাঁ।

ওঃ জানেন ওর আসল নাম কি? ঊষাঙ্গিনী। বাড়ি সিলেটে, কিন্তু দেখায় যেন ও কলকাতার মেয়ে মানুষ। আমার বাড়িও সিলেটে। গাঁয়ের নাম মামুদপুর। শুনবেন ওর স্বভাব-চরিত্র?

বলিলাম, না।······প্রশ্ন করিলাম, কমললতার সঙ্গে আপনার কি কোন সম্বন্ধ আছে?

আছে না!

কি সেটা?

…ও আমার পরিবার হয়। ওর বাপ নিজে থেকে আমাদের কণ্ঠি বদল করিয়েছিল। তার সাক্ষী আছে।

(শরৎসাহিত্য সংগ্রহ চতুর্থ সম্ভার—ষষ্ঠ মুদ্রণ—পৃঃ ৪৭-৪৮)

এইবার শ্রীকান্তের কমললতার নাটক শুরু হল। শ্রীকান্তের যে Fate এতক্ষণ তার অগোচরে ছিল—অদৃশ্য ছিল—সে এবার প্যারাডাইস্‌লষ্টের লুসিফার হয়ে আত্মপ্রকাশ করল।

বোষ্টমী কমললতার আসল নাম উষাঙ্গিনী আদি বাড়ি সিলেট। জাতে শুঁড়ি। এবং ঐ কুৎসিত কদাকার লোকটির নাম মন্মথ। উষাঙ্গিনীর পিতা কলকাতায় ভাল ব্যবসা করেন। ওরা দুই ভাই একবোন। মা থাকেন দেশে। কমললতা পিতার কাছে কলকাতায় থাকত। মাঝে মাঝে মা'র কাছে আসত। তার বিয়ে হয়। পতির নাম শ্রীকান্ত। আর সাধারণ বাঙ্গালী নারীর মতই সে সুখের সংসার পেতে ছিল। হয়তো স্বামীর সঙ্গে মান অভিমানের পালা চলতো। গাইত ঃ—

"সই, কেমনে ধরিব হিয়া ?
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া।"

কিন্তু তারপর—তারপর শরৎসাহিত্যে সচরাচর যা হয়। উষাঙ্গিণীর স্বামী মারা যায়। তারপর—আগেই বলেছি কামনা বাসনাহীন সে নয় বা 'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাই তায়।'

'A very young Lady' নিশ্চয় কিশোরী বিধবা হয়ে বলেছিল—

That time should mee so for remove From that which I was borne to love"

মন্মথ ছিল উষাঙ্গিনীদের সরকার। আর একুশ বছর বয়সে উষাঙ্গিনী হয় সন্তানসম্ভবা। অর্থাৎ হিন্দুঘরের বিধবা অন্য কোন পুরুষকে স্বইচ্ছায় দেহ দান করেছে। সেটা তো কমললতা (উষাঙ্গিনী)

স্বীকার করেছে এবং সে আর কাউকে মন্মথের মত ভালবাসত না। তা হলে বলতে হবে সে তার স্বামীকে ভালবাসেনি? সে আলোচনা পরে করব। শ্রীকান্ত মন্মথের যে রূপ বর্ণনা দিয়েছে তাতে করে উষাঙ্গিনীর মত যুবতী প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয় কি করে তা একমাত্র উষাঙ্গিনী ও ফ্রয়েড জানে। তবু বলা চলে প্রেমের দেবতা অন্ধ। এই উষাঙ্গিনী কমললতাতে রূপান্তরিত হয়ে শ্রীকান্তকে বলেছিল—

—"অথচ ওর চেয়ে আপন একদিন আমার কেউ ছিল না—জগতে অত ভাল বোধ হয় করি কেউ কাউকে বাসেনি।

শ্রীকান্ত নিশ্চয় মনে মনে হেসেছিল। কারণ রাজলক্ষ্মী যে তখনো তার অন্তরবাসিনী। উষাঙ্গিনী মন্মথকে গভীর ভাবেই ভালবাসত। Love is wild. তাই সে সেই কদাকার পুরুষের যৌনতৃষ্ণার শিখানলে আত্মসমর্পণ করে। তার পরিণতি অন্তঃসত্ত্বা।

এই অবস্থায় সে মৃত্যু চেয়েছিল। মন্মথের পিতৃহীন ভাইপো যতীন তাদের বাসায় থেকে কলেজে পড়ত। যতীন উষাঙ্গিনীকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসত। তাই উষাঙ্গিনী যতীনকে গোপনে ডেকে সব কথা খুলে বলে এক টাকার বিষ কিনে আনতে বলল। যতীনের কাছে উষাদেবী, তাই সে বলল, "উষাদিদি, আত্মহত্যার মত মহাপাপ আর নেই। একটা অন্যায়ের কাঁধে আর একটা তার অন্যায় চাপিয়ে দিয়ে তুমি পথ খুঁজে পেতে চাও?

চূড়ান্ত প্রশ্ন—যতীনের Morality বিদ্রোহী হল।

যতীন বিষ আনলো না। উষাঙ্গিনীর মরা হল না। পরম বৈষ্ণব পিতা সব শুনে দুঃখে লজ্জায় মর্মাহত হন। তারপর গুরুদেবের পরামর্শে ঠিক হ'লো মন্মথ ও উষা বৈষ্ণব হয়ে ফুলের মালা আর তুলসীর মালা বদল করে বিবাহিত জীবন যাপন করবে। আর তাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিনা জানা নেই, কিন্তু যে শিশু গর্ভে এসেচে মা হয়ে তাকে যে হত্যা করতে হবে না সেই ভরসাতে উষার

শান্তি। প্রেমের পূর্ণতা জননীত্বে এটা তো সনাতন সত্য। নারী দেহ ও প্রেমের পূর্ণবিকাশ এবং স্বার্থক হল সন্তান লাভ। কত বিধবা সন্তানের মুখপানে চেয়ে পতির শোক ভুলেছে। তাই মন্মথ ও উষার দীক্ষা শেষ হল। উষাঙ্গিনী হল কমললতা। নবদ্বীপে তাদের কণ্ঠবদল পর্ব শেষ হবে। মন্মথ চতুর লোক। সে অর্থপিশাচ। কমললতার দেহটা চেয়েছিল—ভালবাসেনি। তাই প্রথমে কমল-লতার বাবার কাছ থেকে দশহাজার টাকা নেয়। কিন্তু কৈ তাদের বিয়ের পর্বতো সাঙ্গ হচ্ছে না। মন্মথের বেশী দেখা পাওয়া যায় না। এমনি কদিন যায়, তারপরে শুভদিন আবার এসে উপস্থিত হয়। স্নান করে শুচি হয়ে শান্ত মনে ঠাকুরের প্রসাদী মালা হাতে কমল-লতা প্রতীক্ষা করে। সে প্রতীক্ষা যেন শ্রীরাধার প্রতীক্ষা—কুঞ্জ কুটিরে—

"পতিত পতত্রে বিচলিত পত্রে সঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥"

তারপর একদিন নবীন বৈষ্ণবের বেশে মন্মথের দেখা পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কমলতার তনুবল্লরী বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে আনন্দে অধীরা হয়ে কিম্বা দুঃখে বিষণ্ণ হয়ে বা উভয়মিশ্রিত ধারায় এতখানি উজ্জ্বল হল যে ছুটে গিয়ে তার পদধুলি নেয়। কিন্তু তা আর হল না। তার কারণ কি শুধুমাত্র লজ্জা! না। বাসার পুরাতন দাসীর কাছ থেকে সে শুনলো বিয়েতে দরী হল কেন?

দাসী সরল মনে যা বলল—তা হল,

মন্মথ দশহাজার টাকার বদলে বিশহাজার টাকা দাবী করে এবং জাত-কুল-মানের জন্য বাবা রাজী হন ঐ টাকা দিতে। কারন কমললতার এই সর্বনাশের জন্য দায়ী হল—মন্ময়ের ব্যাখ্যা অনুসারে তার ভাইপো যতীন। এবং মন্মথ ও কমললতার পিতা পাঠরত যতীনকে ঘর থেকে ডেকে এনে কর্কশ ভাষায় যাতা বলে অপমান করে। যতীন জানতে চেয়েছিল—এই মিথ্যা কে বলেছে। মন্মথ

পশু কণ্ঠে বলে—উষাই বলেছে তার বাবার কাছে। মন্মথের কথায় বাবাও সায় দেয়। যতীন বাবা ও কমললতা দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করতো। তাই সে আস্তে আস্তে চলে গেল। তার পরদিন সবাই দেখল ভাঙ্গা আস্তাবলের এক কোণে যতীনের মৃতদেহ ঝুলছে। আর ভাইপোর আত্মহত্যার অশৌচ গঙ্গায় ডুব দিয়ে খুল্লতাত শুদ্ধ-পবিত্র হয়ে বর বেশে তাকে গ্রহণ করতে এলো। আর কমললতা সেদিন ঠাকুরের প্রসাদীমালা ঠাকুরের পাদপদ্মে ফিরিয়ে দিয়ে এলো। এবং মন্মথের অশৌচ কাটল—কিন্তু পাপিষ্ঠা উষার অশৌচ ইহজীবনে ঘুচলো না।

তারপর নবদ্বীপে কমললতা মৃত পুত্র প্রসব করে তাকে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিল। বাবা-মা-ভাই-সমাজ সবার হাত থেকে নিস্কৃতি নিয়ে সে বৈষ্টমী হয়ে দেশ দেশান্তরে পাড়ি দেয় একাই।

তারপর কমললতা এসে হাজির হল মুরারীপুর আখড়াতে। এখানেই তার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু। এবং

"Thou water turns't to wine (faire friend of life)
Thy foe to crosse the sweet Arts of thy Reigne
Distills from thence the Teaves of wrath and strife,
And so turnes wine to water back againe."

কমললতা যখন উষাঙ্গিনী ছিল, তখন তার subjective life-এ দেখি। মুরারীপুরে তার objective life. Subjective life-এ কমললতা কোন মতেই মন্মথকে ক্ষমা করতে পারেনি। তাই নিদারুণ ঘৃণায় সে বলে, "কে ও। ও আমার ইহ-পরকালের নরক-যন্ত্রনা। তাইত অহরহ ঠাকুরকে কেঁদে বলি, প্রভু, আমি তোমার দাসী—মানুষের উপর থেকে এত বড় ঘৃণা আমার মন থেকে মুছে দাও—আমি আমার সহজ নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।"

এখন দেখি এই দুরাত্মা মন্মথ কমলতার জীবনে Hell of

Heaven. তাই তো বৈষ্টমী কমললতা নবদ্বীপে সবাইকে ছেড়ে চলেছে—এক নিরুদ্দেশের পানে। কারণ ঃ—

“এতিন ভুবনে ঈশ্বর গতি।
ঈশ্বর ছাড়িতে পরে শকতি॥
ঈশ্বর ছাড়িলে দেহ না রয়।
মানুষ ভজন কেমনে হয়॥
সাক্ষাৎ নহিলে কিছুই নয়।
মনেতে ভাবিলে স্বরূপ হয়॥”

কমললতাকে বুঝতে হলে Virginia woolf-এর একটা উক্তিকে স্মরণ রাখতে হয়—“The ancient consciousness of woman, charged with suffering and sensibility, and for so many ages dumb, seems in them to have brimmed and over flowed and uttered a demand for something—They scarcely know what, for something that is perhaps incompatible with the facts human existence.”

এই human existence কমললতার চরিত্রের মধ্যে প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে। তার চাওয়া-পাওয়ার অকূল পাথারে কূল পাবার চেষ্টা করতে গিয়ে শ্রীকান্ত নিমজ্জিতপ্রায়। কারণ কমললতা যে তার কাছে সর্বদা ‘মিস্টিক’ হয়ে আছে। এই নারীর সাধন-পূজন—দেবতা আরাধনার মধ্যে মর্তের মানবীর মধুর মমতাই প্রচ্ছন্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। সে তার জীবনের হিসাবের খাতা তৈরী করেনি। সে তার জীবনের শেষ পরিণতির কথা ভাবে নি। সে তার সামাজিক পারিপার্শ্বিকতাকে জ্ঞেয় জ্ঞান করেনি। তার একমাত্র লক্ষ্য এগিয়ে চলো—অথবা গীতার উক্তি ‘মা ফলেসু কদাচন।’ কমললতার একটা জীবন—এ-জীবনের মূল্যায়ণ করা শ্রীকান্তের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়।—তার কারণ পুরুষ তো নারীর অন্তরের অন্তম গহ্বরের খোঁজ রাখে না। পুরুষ জানে না—

কোন কোন নারীর মধ্যে এক বিস্তৃর্ন স্বর্গীয় সুষমা বিরাজ করে—তা সে নারী যতই পাপিষ্ঠা বা কুলত্যাগী হোক না কেন। পাঠক বলবেন—শ্রীকান্তের বৈরাগীমন নারীর বিষয় অত শত চিন্তা করবে কিসের জন্য। আমি উত্তর দিব—শ্রীকান্ত বৈরাগী নয়—যতখানি বৈরাগী ও উদাসী কমললতা। অবশ্য এক্ষেত্রে শ্রীকান্তের চেয়ে গহর বেশী মাত্রায় বৈরাগী ও উদাসী।

কমললতার সম্বন্ধে জানতে গিয়ে কবি Thomas Carew-র "To a lady that desired I would love her" কবিতা মনে পড়ে।

"Now you have freely given me leave to love,
What will you doe ?
Shall I your mirth, or passion move
When I begin to wooe ;
Will you torment, or scorne, or love me too ?

Each pettie beautie can disdain, and I
Spight of your hate
Without your leave can see, and dye ;
Dispence a nobler Fate,
'Tis easie to destroy, you may create.

Then give me leave to love, and love me too,
Not with designe.
To rayse, as loves curst Rebells doe,
When puling poets whine,
Fame to their beautie, from their blubbr'd eyne,

Griefe is a puddle, and reflects not cleare
Your beauties rayes,
Joyes are pure streames, your eyes appeare.
Sullen in sadder layes,
In chearfull numbers they shine bright with prayse ;

Which shall not mention to expresse you fayre
Wounds, flames, and darts,
Stormes in your brow, nets in your haire,
Suborning all your parts,
Or to betray, or torture captive hearts
I'le make your eyes like morning Suns appeare,
As milde, and faire ;
Your brow as crystall smooth, and cleare,
And your dishevell'd hayre
Shall flow like a calm Region of the Ayre.

Rich natures store, (which is the Poets Treasure)
I'le spend, to dresse
Your beauties, if your mine of pleasure
In equall thankfulnesse
You but unlocke, so we each other blesse,"

কমললতার প্রেম ও তার মনের গোপন কথাকে শ্রীকান্ত তার চিরসঙ্গিনী রাজলক্ষ্মীকে বোঝাতে পারে নি। কারণ কমললতা দুর্ভেদ্য, দুর্জ্ঞেয়, অজেয়। এক আকাশ দিগন্ত বিস্তৃত ছায়া পথ। রাজলক্ষ্মীকে কমললতা সম্পর্কে কিছু বলতে হলে—বলতে হবে—

"Ask me no more where love bestowes,
When June is past, the fading rose ;
For in your beauties orient deepe,
These flowers as in their causes, sleepe."

এরও একটা কারণও আছে। কারণ কমললতার কথার মধ্যে হেয়ালি ভাব। এটাই তো এই নারীর আকর্ষণী শক্তি। একটা বুকভরা ভালবাসা তার মধ্যে সর্বদা বিরাজ করলেও কারুর তো সাধ্যি হ'ল না সেই ভালবাসার সবটুকু রস নিংড়ে নিয়ে তার স্বাদ গ্রহণ করার।

এই অধ্যায়ে কবি ও সমালোচক মোহিত লাল মজুমদারের উক্তি তুলে দিয়ে সীমা টানছি।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীকান্তের নিকটে কমললতার ঐরূপ প্রেম-ভিক্ষা ও তাহার সেই কাতরতা আমাদিগকেও বিস্মিত করে, মনে হয় সাধারণ নারীর সহিত তাহার তবে পার্থক্য কোথায়? এই পার্থক্যই বুঝিয়া লইতে হইবে, না লইলে এই উপন্যাসের একটি অপূর্ব্ব নারী-চরিত্র আমাদের অপরিচিত থাকিয়া যাইবে। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, একটা বিশেষ সাধনার প্রতি সশ্রদ্ধ মনোযোগ চাই। আমি বলিয়াছি এই কমললতা-চরিত্র—শুধু সমাজ নয়, সংসারেরও বহির্ভূত। অতএব উহাকে আমাদের অভ্যস্ত সামাজিক বা সাংসারিক সংস্কারের দ্বারা বুঝিয়া লওয়া যাইবে না। রাজলক্ষ্মী পতিতা হইলেও সমাজ সম্পর্কহীন নয়; সমাজ হইতে বহিস্কৃত হইলেও সে নিজে তাহার নারী-ধর্ম্মে ও নীতি-সংস্কারে সমাজকে ত্যাগ করে নাই। কমললতার সেই নারী-ধর্ম্মেই একটা রূপান্তর ঘটিয়াছে; আর সকল নীতি-সংস্কার অতিক্রম করিয়া সে এমন একটা কিছুকে আশ্রয় করিয়াছে যাহাতে অন্তরের মুক্তি ঘটে, বন্ধনের মধ্যেও বন্ধন-বোধ থাকে না। কিন্তু আমরা কি তাহা বুঝিতে পারিব? বুঝাইবার ভাষা যে আমাদের নাই; আমাদের ভাষায় উহাও একটা বন্ধন। তাই এ তত্ত্ব দুরূহ, ইহাকে যুক্তির দ্বারা বুঝানো যাইবে না; মূলে ইহা মিষ্টিক, অর্থাৎ জ্ঞানগম্য নয়—সাক্ষাৎ উপলব্ধির বস্তু; ইহাকে যোগেযাগে বুঝিয়া লইতে হইবে। তাহার জন্য কমললতার অন্তর্জ্জীবনের—তাহার সেই সাধনাশীল অন্তঃকরণের একটু পরিচয় দিব—শ্রীকান্তের জবানীতেই দিব। শ্রীকান্ত লিখিয়াছে—

জিজ্ঞাসা করিলাম, সারাদিন কি তোমাদেব করতে হয়?

বৈষ্ণবী কহিল, এসে যা দেখলে, তাই।....

কিন্তু এ সব ত কেবল ঘর-গৃহস্থালীর কাজ, সব মেয়েরাই করে। তোমরা ভজন-সাধন করো কখন?

বৈষ্ণবী কহিল, এই আমাদের ভজন-সাধন।

এই রাঁধা-বাড়া, জল-তোলা, কুট্‌নো-বাটনা, মালা-গাঁথা, কাপড়-ছোপানো— একেই বলে সাধনা?

বৈষ্ণবী বলিল, হাঁ, একেই বলি সাধনা। দাস-দাসীর এর চেয়ে বড় সাধনা আমরা পাবো কোথায় গোঁসাই? বলিতে বলিতে তাহার সজল চোখ দুটি যেন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমার হঠাৎ মনে হইল, এই অপরিচিত বৈষ্ণবীর মুখের মত সুন্দর মুখ আমি সংসারে কখনো দেখি নাই। বলিলাম, কমললতা, তোমার বাড়ী কোথায়?

বৈষ্ণবী আঁচলে চোখ মুছিয়া হাসিয়া বলিল, গাছতলায়।

[শ্রীকান্ত : ৪র্থ পর্ব্ব, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

শ্রীকান্ত বা শরৎচন্দ্র মিষ্টিক নয়, কিন্তু ঐ যে হঠাৎ মনে হইল", ইত্যাদি উহার মত মিষ্টিক অনুভূতি আর কি হইতে পারে? বৈষ্ণবীর ঐকথাগুলি শুধুই কথা নয়, তাহা এমনই অনুভূতিময় যে তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য বৈষ্ণবীর মুখখানাকেও সেই-ক্ষণে সুন্দর করিয়া তুলিল—সেই ভাবই রূপময় হইয়া উঠিল, ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'transfigured' হওয়া। কিন্তু শ্রীকান্তও তাহার medium হইয়াছে, নতুবা ঐ অতীন্দ্রিয় দৃশ্য আমরা দেখিতে পাইতাম না। আমি বলিয়াছি, এই পর্বে শ্রীকান্ত যেন নিজেকেও অতিক্রম করিয়াছে, তাহার প্রাণের সূক্ষ্মতম তন্ত্রীর আওয়াজ এই পর্বেই বারবার পাওয়া গিয়াছে।

পরদিন রাত্রিশেষে শ্রীকান্ত যাহা দেখিল ও শুনিল—

...বোধ হয় একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম, কে যেন দ্বারের বাহিরে ডাক দিল, নতুন, গোঁসাই, মন্দিরে যাবে না? ওঁরা তোমাকে ডাকচেন যে।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। মন্দিরা সহযোগে কীর্ত্তন-গান কানে গেল, বহুলোকের সমবেত নয়, গানের কথাগুলি যেমন মধুর

তেমনি সুস্পষ্ট। বাম-কণ্ঠ, রমণীকে চোখে না দেখিয়াও নিঃসন্দেহে অনুমান করিলাম, এ কমললতা। ...

মন্দিরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে একধারে গিয়া বসিলাম, কেহ চাহিয়া দেখিল না। সকলের দৃষ্টিই রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির প্রতি নিবদ্ধ। মাঝখানে দাঁড়াইয়া কমললতা কীর্ত্তন করিতেছে—মদন গোপাল জয় জয় যশোদাদুলাল কি, যশোদাদুলাল জয় জয় নন্দদুলাল কি।...

এই সহজ ও সাধারণ গুটি-কয়েক কথার আলোড়নে ভক্তের গভীর বক্ষস্থল মন্থিত করিয়া কি সুধা তরঙ্গিত হইয়া উঠে, তাহা আমার পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন, কিন্তু দেখিতে পাইলাম, উপস্থিত কাহারও চক্ষুই শুষ্ক নয়। গায়িকার দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া দরদর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে এবং ভাবের গুরুভারে তাহার কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল বলিয়া।...

ভাবের এই বিহ্বল মুগ্ধতাকে আমি অত্যন্ত ভয় করি, ব্যস্ত হইয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম— কেহ লক্ষ্যও করিল না।...নিশ্চয় জানি, জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে আমি ইহাদের সকলের বড়, তথাপি কিসের ব্যথায় জানি না, মনের ভিতরটা কাঁদিতে লাগিল এবং তেমনই অজানা কারণে চোখের কোণ বাহিয়া বড় বড় ফোঁটায় জল গড়াইয়া পড়িল।

শ্রীকান্তের ঐ শেষের কথা-কয়টিতে কমললতার অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হয়—শ্রীকান্ত এ সকলকে ভয় করে, তার কারণ, শ্রীকান্তের ভাব-কাতরতা এত বেশি যে, সে তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে চায়। কমললতা তাহাকে দেখিয়াই চিনিয়াছিল। ইহার পর আর একদিন—

...দুপুর বেলায় কোন একফাঁকে বলিলাম, কমললতা, আমি জানি, তুমি অন্য সকলের মতো নও। সত্যি বলো ত, ভগবানের প্রতীক এই যে পাথরের মূর্ত্তি—

বৈষ্ণবী হাত তুলিয়া আমাকে থামাইয়া দিল, কহিল, প্রতীক কি

গো—উনিই যে সাক্ষাৎ ভগবান। এমন কথা আর কখনো মুখেও এনো না, নতুনগোঁসাই—

আমার কথায় সে-ই যেন লজ্জা পাইল বেশী। আমিও কেমন একপ্রকার অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম, তবুও আস্তে আস্তে বলিলাম, আমি ত জানি নে, তাই জিজ্ঞাসা করচি, তোমরা কি সত্যই ভাবো ঐ পাথরের মুর্ত্তির মধ্যেই ভগবানের শক্তি এবং চৈতন্য, তাঁর—

আমার এ কথাটাও সম্পূর্ণ হইতে পাইল না, সে বলিয়া উঠিল, ভাবতে যাবো কিসের জন্য গো এ যে আমাদের প্রত্যক্ষ। সংস্কারের মোহ তোমরা কাটাতে পারো না বলেই ভাবো, রক্তমাংসের দেহ ছাড়া চৈতন্যের আর কোথাও থাকবার যো নেই। কিন্তু তা কেন? আর এ-ও বলি, শক্তি আর চৈতন্যের হদিস কি তোমরাই সবখানি পেয়ে বসে আছ যে বলবে, পাথরের মধ্যে তার জায়গা হবে না? হয় গো হয়, ভগবানেরও কোথাও থাকতেই বাধা পড়ে না, নইলে তাঁকে ভগবান বলতে যাবো কেন বলো ত? [ঐ]

ইহার পর আরও একটু আছে—

বৈষ্ণবী কহিল, কি গোঁসাই, কথা কও না যে?

বলিলাম, ভাবচি।

কাকে ভাবচো?

ভাবচি তোমাকেই।

ইস্! বড় সৌভাগ্য যে আমার! একটু পরে কহিল, তবুও থাকতে চাও না কোথায় কোন্ বর্ম্মীদের দেশে চাকরি করতে যেতে চাও। চাকরি করবে কেন?

বলিলাম, আমার ত মাঠের জমিজমাও নেই, মুগ্ধ ভক্তের দলও নেই—খাব কি?

ঠাকুর দেবেন।

কহিলাম, অত্যন্ত দুরাশা। কিন্তু তোমাদেরও যে ঠাকুরের ওপর খুব ভরসা তাও ত মনে হয় না। নইলে ভিক্ষে করতে যাবে কেন?

বৈষ্ণব কহিল, যাই তিনি দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দোরে দোরে দাঁড়িয়ে থাকেন বলে। নইলে নিজেদের গরজ নেই, থাকলে যেতুম না, না খেয়ে শুকিয়ে মরলেও না। [ঐ]

কমললতার সাধন-জীবনের পরিচয় এইটুকুই যথেষ্ট, ইহার পর তাহার শিক্ষা দীক্ষা বা মানসিক সংস্কৃতির একটু পরিচয় দেওয়াও দরকার; স্কুল-কলেজের শিক্ষা নয়, বিদ্যা বা 'কুলচুর' নয়, বরং ঘোরতর অশিক্ষা ও কুশিক্ষা, এবং পূর্ব্বের ঐ পৌত্তলিক কুসংস্কার হইতেই যাহা হইয়াছে—তাহারই কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিব।

কমললতা তাহার জীবনের কাহিনী বলিয়া যাইতেছে, সেই কাহিনীতে এমন একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা, এবং তাহার মূলে মানুষের পৈশাচিক দুষ্কৃতির এমন একটা দৃষ্টান্ত ছিল, যেমনটি এই সমাজের পক্ষেই সম্ভব; সেই ধরনের ঘটনা, ও চরিত্র একমাত্র শরৎচন্দ্রই তাঁহার উপন্যাসগুলিতে বীভৎস-করুণ করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। একদিকে একপক্ষের সমাজ-শাসনের ভয়, অপর দিকে একটা নর-পশুর দারুণ লালসা—কাম-লালসা ও অর্থ-লালসা দুই-ই; এই দুয়ের মধ্যে পড়িয়া নিষ্পাপ যুবকের সেই যে আত্মহত্যা, এবং তাহার জন্য মূলে সে যে নিজেই দায়ী—এই কথা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল; কতক্ষণ পরে—

...বৈষ্ণবী আর্দ্র মৃদুকণ্ঠে নিজেই বলিল, দ্যাখো গোঁসাই, পাপ জিনিসটা সংসারে এত ভয়ঙ্কর কেন জানো?...জানিনে তোমার বিশ্বাস কি, কিন্তু সেদিন থেকে আমি একে আমার মতো করে বুঝে রেখেচি, গোঁসাই। স্পর্দ্ধাভরে তুমি কত লোককে বলতে শুনবে, কিছুই হয় না। তারা কত লোকের নজীর দিয়ে তাদের কথা প্রমাণ করতে চাইবে। কিন্তু তার ত কোন দরকার নেই। তার প্রমাণ মন্মথ, প্রমাণ আমি নিজে। আজও কিছু আমাদের হয়নি। হলে একে এতো ভয়ঙ্কর আমি বলতুম না। কিন্তু তা ত নয়, এক দণ্ড ভোগ করে নিরপরাধ নির্দ্দোষী লোকেরা। যতীনের বড় ভয় ছিল

আত্মহত্যায়, কিন্তু সে তাই দিয়ে তার দিদির অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল। বলো ত গোঁসাই, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সংসারে আর কি আছে? কিন্তু এমনি হয়, এমনি করেই ঠাকুর বোধ হয় তাঁর সৃষ্টি রক্ষে করেন।

[শ্রীকান্ত ঃ ৪র্থ পর্ব্ব, ৭ম পরিচ্ছেদ]

সেই নরপশুটার সম্বন্ধে শ্রীকান্ত তাহাকে প্রশ্ন করিলে, কমললতা বলিয়াছিল—

কে ও? ও আমার ইহ-পরকালের নরক-যন্ত্রণা। তাই ত অহরহ ঠাকুরকে কেঁদে বলি, প্রভু, আমি তোমার দাসী—মানুষের ওপর থেকে এত বড় ঘৃণা আমার মন থেকে মুছে দাও—আমি আবার সহজ নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। [ঐ]

আর একদিন কমললতা প্রেম-নামক বস্তুটির সমালোচনা করিতেছে—যে-বস্তুর আলোচনা ও সমালোচনা করিতে আমি এই এতগুলা পৃষ্ঠা ভরিয়াও কূল পাইতেছি না।

বৈষ্ণবী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, হাঁ গোঁসাই, এ বয়সে সত্যিই কাউকে কখনো ভালবাসো নি?

তোমার কি মনে হয় কমললতা?

আমার মনে হয়—না। তোমার মনটা হল আসলে বৈরাগীর মন, উদাসীনের মন—প্রজাপতির মতো। বাঁধন তুমি কখনো কোন কালে নেবে না।

…আমার ভালবাসার মানুষ কোথাও যদি সত্যিই কেউ থাকে, তার কানে গেলে সে অনর্থ বাধবে।

বৈষ্ণবীও হাসিল, কহিল, ভয় নেই গোঁসাই, সত্যিই যদি কেউ থাকে, আমার কথায় সে বিশ্বাসও করবে না, তোমার মধু-মাখানো ফাঁকিও সে সারা জীবনে ধরতে পারবে না।

বলিলাম, তবে তার দুঃখ কিসের? হোক না ফাঁকি, কিন্তু তার কাছে ত সেই সত্যিই হয়ে রইলো।

বৈষ্ণবী মাথা নাড়িয়া কহিল, সে হয় না গোঁসাই, মিথ্যে কখনও সত্যির জায়গা নিয়ে থাকতে পারে না। তারা বুঝতে না পারুক, কারণটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট না হোক, তবু অন্তরটা তাদের নিরন্তর-অশ্রুমুখী হয়েই থাকে। মিথ্যের কাণ্ড দেখেছি ত।…

…তারা রসের খবর ত পায় না, তাই প্রাণহীন নির্জীব পুতুলের নিরর্থক সেবায় প্রাণ তাদের দুদিনে হাঁপিয়ে ওঠে, ভাবে এ কোন্ মোহের ঘোরে নিজেকে দিনরাত ঠকিয়ে মরি।…কিন্তু এমন যদি কেউ তোমার থাকে, তুমি তাকে ভুলবে, কিন্তু সে তোমাকে না পারবে ভুলতে, না শুকোবে কখনো তার চোখের জলের ধারা।

…তুমি কি আমাকে এই কথাই বলতে চাও কমললতা যে, আমাকে ভালবাসার নামই হল, দুঃখ পাওয়া?

দুঃখ ত বলি নি গোঁসাই, বলেছি চোখের জলের কথা।

কিন্তু ও দুই-ই এক কমললতা, শুধু কথার ঘোরফের।

বৈষ্ণবী কহিল, না গোঁসাই, ও দুটো এক নয়। না কথার ঘোরফের, না ভাবের। মেয়েরা ওর এটাও ভয় করে না, ওটাও এড়াতে চায় না। কিন্তু তুমি বুঝবে কি করে? [ঐ]

কমললতার ঐ যে কথাগুলি উহা যেন নারীপ্রেমের ব্রহ্মতত্ত্ব। ঐ-কথা শুনিয়া আমার লজ্জা হইতেছে—আমি রাজলক্ষ্মীর প্রেম লইয়া এত গবেষণা করিতেছি, কিন্তু এমন সংক্ষেপে এমন গভীর করিয়া মূলকথাটা কি এখনো বলিতে পারিয়াছি? তার কারণ, এমন করিয়া কোন সত্যকে চাক্ষুষ করিতে হইলে তাহা বিশ্বাস করিবার মত অভিজ্ঞতা থাকা চাই—নিজে তাহাই হইতে হয়, নতুবা সকল তর্ক সকল বিচারই বৃথা। আমি রাজলক্ষ্মী-কাহিনী যতই বুঝিবার বা বুঝাইবার চেষ্টা করি না কেন, এমন প্রত্যয় তাহাতে নাই, তাই যতই বিশ্লেষণ করি ততই তাহা জটিল হইয়া উঠে; যদি সেই বিশ্বাস থাকিত, তবে আমাকে এত ঘুরিয়া মরিতে হইত না। তবু কমললতার কথা যে কত সত্য, আমার এই দীর্ঘ আলোচনায় তাহার

কিছু প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমরা এখানে কমললতারই পরিচয় করিতেছি—রাজলক্ষ্মীর নয়, অতএব তাহার নিজের হৃদয়ের সংবাদও চাই। সেই বাগানে ফুল তুলিবার সময়ে তাহার ব্যথার ব্যথী হইয়া শ্রীকান্ত যাহা বলিয়াছিল তাহাতে বাধা দিয়া সে শ্রীকান্তকে কিরূপ লজ্জিত করিয়াছিল, পূর্ব্বে আমরা তাহা দেখিয়াছি—এক্ষণে সেই দৃশ্যের বাকিটুকু তুলিয়া দিলেই হইবে।

বৈষ্ণবী ভিতরে প্রবেশ করিল, সঙ্গে আমিও গেলাম। ফুল তুলিতে আরম্ভ করিয়া সে নিজেই কহিল, আমি সুখেই আছি গোঁসাই। যাঁর পাদপদ্মে আপনাকে নিবেদন করে দিয়েছি কখনো দাসীকে তিনি পরিত্যাগ করবেন না।

সন্দেহ হইল কথার অর্থটা বেশ পরিষ্কার নয়, কিন্তু সুস্পষ্ট করিতে বলারও ভরসা হইল না। সে মৃদু গুঞ্জনে গাহিতে লাগিল —"কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে, কানু-গুণ-যশ কানে পরিব কুণ্ডলে। কানু অনুরাগে রাঙা বসন পরিয়া, দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া।..."

...ডালা ভরিয়া উঠিলে কহিল, হয়েছে—আর না।

স্থলপদ্ম তুললে না?

না, ও আমরা তুলি নে, ঐখান থেকে ঠাকুরকে নিবেদন করে দিই। চলো এবার যাই।

[শ্রীকান্ত ঃ ৪র্থ পর্ব্ব, ৮ম পরিচ্ছেদ]

পাঠকপাঠিকারা কিছু বুঝিলেন?—ঐ স্থলপদ্ম নিবেদন-করা পর্য্যন্ত? এ প্রেম আমাদের বুদ্ধির অগম্য—মানুষ, ভগবান, সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন, সব এক হইয়া গেছে।

কমললতার এই যে পরিচয় আমরা পাইলাম, ইহার পর শ্রীকান্তের প্রতি তাহার ঐ অনুরাগ, এবং সেই উক্তি—"কিন্তু আমি কতদিনে এই ব্যথা সামলাবো তাই কেবল ভাবি"—তাহার সেই বুকভরা বেদনার কি অর্থ আমরা করিব? উহাও কি সাধারণ নর-

নারীর মতই প্রেমে-পড়া? তাহা হইলে কমললতার ঐ পরিচয়টাও যে মিথ্যা হইয়া পড়ে। তবু ঐ কাতরতা কেন? সকল প্রেমেই কাতরতা থাকে, কিন্তু প্রেমও যেমন এক স্তরের নয়, তেমনই কাতরতাও একরূপ নয়। বৈষ্ণবের প্রেমসাধনায় যে-প্রেম 'নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়"—তাহাতেও ঐ কাতরতা, ঐ আর্ত্তি'ই সে-প্রেমের পারিজাত-সৌরভ; উহাই সেই সাধনার একটা বড় তত্ত্ব। বেদান্ত-মতে বিন্দুই সিন্ধু—বৈষ্ণব তাহা মানে না, তাহা চায়ও না; সেই বিন্দু—বিন্দু থাকিয়াই সিন্ধুকে আপন করিতে চায়; অসীমকে সীমার বাঁধনে বাঁধিয়া, ব্যবধান সত্ত্বেও সেই যে মিলন—একই কালে বিরহ ও মিলনের সেই যে রস—তাহাই অমৃতোপম। এইজন্য তাহাতে চোখের জল কখনো ঘোচে না, মুছিতেও চায় না। এ প্রেম দুঃখকে ভয় পায় না, তাই কমললতার মুখেও ঐ কথা—"দুঃখ ত বলিনি, গোঁসাই, বলেছি চোখের জলের কথা।" এ তত্ত্ব বড় গভীর। ঐ চোখের জল আর দুঃখ এক নয়, চোখের জলও বড় সুখের। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে ঐ প্রেমেরই অপর নাম ভক্তি—ঐ প্রেমের শাস্ত্রকেই ভক্তিশাস্ত্র বলা হয়। সেখানে ভক্তির অর্থ কি তাহা কমললতার ঐ সাধনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। একজন ভক্তিশাস্ত্রবিদ্ মহাত্মা ঐ 'চোখের জল' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

বিরহে অশ্রু, মিলনেও অশ্রু; এবং এক কথায় সমগ্র ভক্তিশাস্ত্রের সার সর্ব্বস্বটি বলিতে হইলে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হয় যে, গোবিন্দ চক্ষুর জল ঘুচায় না, মুছায়। নিত্য সঙ্গ দেয় না, বিরহ-বিষে কাতরা করিয়া পরে বারংবার সঙ্গ-দান করিয়া—অশ্রুলাঞ্ছিত গোপী-বদন নিজ পটাঞ্চলে স্বহস্তে মুছাইয়া দেয়।

[অভয়ের কথা]

ইহার অর্থ, ঐ যে অশ্রু উহার বড় প্রয়োজন আছে। ঐ অশ্রু যদি না থাকিবে, তবে আমার সেই পরম প্রেমাস্পদের আদর-

সোহাগ ভুঞ্জিব কেমন করিয়া ? তিনি স্বহস্তে তাহা মুছাইয়া দিবেন —ইহার মত সুখ আর কি আছে ? অতএব ঐ প্রেমের সার বস্তু ঐ 'আর্ত্তি'। বেশ বুঝিতে পারা যায়, মানবতাই ঐ সাধনার নিদান —বেদনাই ত মানবতা ; বৈষ্ণব-সাধনার সর্ব্বোচ্চ সোপানেও ঐ মানবতা জয়ী হইয়া আছে। তথাপি উহা লৌকিক প্রেম নয়— অলৌকিক ; ঐ মানবতাও অতি সূক্ষ্ম ও উচ্চস্তরের ; ঐ মানব— বেদান্তের মুক্ত আত্মাও যেমন নয়, তেমনই প্রাকৃত বা লৌকিক কামনা-বাসনায় বদ্ধ আত্মাও নয় ; শরীরী বটে, কিন্তু দিব্যশরীরী —দিব্যদেহবাসী আত্মা।

তাই ঐ প্রেমেরও সাধন-সঙ্গীতে—ঐ বৈষ্ণব পদাবলীতে— আমরা লৌকিক নায়িকা-প্রেমের বর্ণনা পাইয়া যেমন মুগ্ধ হই, তেমন ভুল করি। অতি উচ্চস্তরের যাহা, তাহাতে নিম্নস্তরের—আমাদের সাধারণ কামনা-বাসনার, এমন কি লালসারও চিত্র দেখি। কমললতা ঐ যে বলিয়াছে, "আমি যে এই ব্যথা কতদিনে সামলাবো তাই কেবল ভাবি"—উহাতে আমাদের সংস্কার-অনুযায়ী একটা সহজ ধারণাই হয়, কিন্তু ইহা সেই—

Infinite passion and the pain
Of finite hearts that yearn.

আবার ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, কমললতা এখনোও তাহার সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করে নাই, তাই শ্রীকান্তকে তাহার প্রয়োজন ছিল। এই কমললতাই শ্রীকান্তকে তাহার প্রেম নিবেদন করিল। এ প্রেম সংসারে প্রেম নয়। সে শ্রীকান্তকে লইয়া গৃহ-সুখ ভোগ করিতে চায় না। শ্রীকান্তকে সে চিনিয়াছে—রাজলক্ষ্মীর মত নয়, এ আর একরকমের চেনা; তাই সে শ্রীকান্তকে বলিল—

অনেকদিন পথে পথেই ছিলুম গোঁসাই, সঙ্গী পাই ত আবার একবার পথই সম্বল করি।

বলিলাম, তোমার সঙ্গীর অভাব একথা ত বিশ্বাস হয় না কমললতা। যাকে ডাকবে সে ই যে রাজী হবে।

বৈষ্ণবী হাসিমুখে কহিল, তোমাকে ডাকছি নতুন গোঁসাই রাজী হবে ?…

…চলো না গোঁসাই, বেরিয়ে পড়া যাক। বলছিলে শ্রীবৃন্দাবনধাম কখনো দেখো নি, চলো তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। অনেকদিন ঘরে বসে কাটলো, পথের নেশা আবার যেন টানতে চায়। সত্যি, যাবে নতুনগোঁসাই ?

[শ্রীকান্ত : ৪র্থ পর্ব্ব, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

কমললতা শ্রীকান্তকে এই যে ডাক দিতেছে তাহার ফল কি হইবে সে সম্বন্ধে তাহার মনে কোন সংশয় নাই, তবু ডাকিল কেন ? তাহার নিজের জন্য নয়। কমললতা শ্রীকান্তের সেই অন্তরবাসী মানুষটাকে, তাহার সেই আত্মদ্রোহী আত্মাকে চিনিতে পারিয়াছে, তাই সে তাহাকে তাহার সেই ভ্রান্তিমোচনের বা আত্মপরিচয়-সাধনের একটা সুযোগ দিল, জানে তাহা নিষ্ফল, তবু তাহাকে একটা সত্যের ইঙ্গিত দিল। সে ইঙ্গিত যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নাই, এ কাহিনীর শেষে আমরা তাহা দেখিতে পাইব। কমললতা শ্রীকান্ত সম্বন্ধে তাহার চরম সিদ্ধান্ত একদিন জানাইয়াছিল, পূর্ব্বে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি—সে বলিয়াছিল, তোমার ঐ উদাসীন বৈরাগী মন ওর চেয়ে বড় অহঙ্কারী জগতে আর আছে নাকি ?" শ্রীকান্ত কিন্তু নিজের মত করিয়াই কমললতার এই সব কথার অর্থ করিয়াছে—সে যে সকলই বোঝে। সে বলিতেছে—

আর একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম। এবার আর সন্দেহের লেশমাত্র রহিল না যে, সে পরিহাস করিতেছে না। আমি যে মাত্র উপলক্ষ তাহাও নিশ্চিন্ত, কিন্তু যে কারণেই হোক এখানের বাঁধন ছিঁড়িয়া এই মানুষটি পলাইতে পারিলেই যেন বাঁচে—তাহার এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব সহিতেছে না। [ঐ]

আর একদিন কমললতা যখন তাহাকে তাহার প্রেমবিমুখ আত্মাভিমান-সর্ব্বস্বতার কথা বলিয়াছিল, তাহাতে শ্রীকান্ত আপত্তি জানাইলে, অর্থাৎ কমললতা যে তাহার মন জানে না, জানিতে পারে না, ইহা স্মরণ করাইয়া দিলে, সে বলিয়াছিল—

···নিশ্চয় জানি। তাই তোমার বড়াই আমার সয় না।

আশ্চর্য্য হইলাম। বলিলাম, বড়াই ত তোমার কাছে কখনো করিনি, কমললতা?···কিন্তু এই দুটো দিনের মধ্যে আমাকে এত তুমি জানলে কি করে?

জানলুম তোমাকে ভালবেসেছি বলে।···

প্রশ্ন করিলাম, ভালবেসেছো একি সত্যি কমললতা?

হঁা, সত্যি।

কিন্তু তোমার জপ-তপ, তোমার কীর্ত্তন, তোমার রাত্রি-দিনের ঠাকুর-সেবা এ সবের কি হবে বলো ত?

বৈষ্ণবী কহিল, এরা আমার আরও সত্যি, আরও সার্থক হয়ে উঠবে। চলো না গোঁসাই, সব ফেলে দু'জনে পথে পথে বেরিয়ে পড়ি?

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, সে হয় না, কমললতা, কাল আমি চলে যাচ্ছি।···

বৈষ্ণবী মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, কিন্তু এ আশ্রমে আবার তুমি আসবে, তখন কিন্তু কমললতাকে আর খুঁজে পাবে না গোঁসাই। [শ্রীকান্ত: ৪র্থ পর্ব্ব, ৭ম পরিচ্ছেদ]

ঐ প্রেম, আর ঐ প্রত্যাখ্যান! শ্রীকান্ত তাহার ঐ প্রেমকে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা করিতে পারিল না—না পারিবার কারণ একটাই, সে প্রেম-জিনিষটাকে কখনো—শক্তি বা স্বাস্থ্যের লক্ষণ মনে করে না। কমললতার ঐ যে বিশ্বাস এবং ঐকান্তিক আকূতি উহারও সে একটা অর্থ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে—

তবু মনে হয় বিস্ময়ের কিছু নাই। রসের আরাধনায় আকণ্ঠ

মগ্ন থাকিয়াও তাহার একান্ত (কমললতার) নারী-প্রকৃতি আজও হয় ত রসের তত্ত্ব পায় নাই। সেই অসহায় অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তি এই নিরবচ্ছিন্ন ভাব-বিলাসের উপকরণ সংগ্রহে হয় ত আজ ক্লান্ত—দ্বিধায় পীড়িত। সেই তাহার পথভ্রষ্ট বিভ্রান্ত মন আপন অজ্ঞাতসারে কোথায় যে অবলম্বন খুঁজিয়া মরিতেছে, বৈষ্ণবী তাহার ঠিকানা জানে না—আজ তাই সে চমকিয়া বারে বারে তাহার বিগত জনমের রুদ্ধ দ্বারে হাত পাতিয়া অপরাধের সান্ত্বনা মাগিতেছে। তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারি, আমার 'শ্রীকান্ত' নামটাকেই পাথেয় করিয়া আজ সে খেয়া ভাসাইতে চায়। [ঐ]

কিন্তু ইহা শ্রীকান্তের নিজেরই সান্ত্বনা,—বৈষ্ণবী তাহার ঠিকানা যে ভালরূপেই জানে, সে কথা সে-ও একদিন স্বীকার করিবে।

কিন্তু আমাদের মনে তবু একটা খট্‌কা থাকিয়া যায়; শ্রীকান্ত ঐ প্রেমের বরং একটা ভদ্র রকমের ব্যাখ্যাই করিয়াছে, আমাদের সংস্কারে কোথায় যেন বাধে। কমললতার ঐ প্রেম যে তাহার পূর্ব্বজীবনের সেই কলুষ-পঙ্কেরই একটা লালসা-কীট নহে (আমাদের সংস্কার যে বড় অবাধ্য!) তাহার প্রমাণ, গহরগোঁসাইকে লইয়া তাহার সেই প্রাণান্তিক সঙ্কট ; সে যে কেমন সঙ্কট, পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয় তাহা বুঝিয়াছেন। শ্রীকান্তের সন্দেহও তাই ঘুচে নাই।—

...বৈষ্ণবী কিসের জন্য চলিয়া যাইতে চায়?...এ গহর।...রাগ করিবার লোক সে নয়, কিন্তু কেন সে আর আসে না? হয় ত বা নিজের মনে মনে কি কথা সে ভাবিয়া লইয়াছে।...ভাল যদি সে বাসিয়াও থাকে, মুখ ফুটিয়া কোন দিন হয় ত সে বলিবেও না, কোথাও পাছে কোন অপরাধ স্পর্শে। বৈষ্ণবী ইহা জানে। সেই অনতিক্রম্য বাধায় চির-নিষিদ্ধ প্রণয়ের নিষ্ফল চিত্তদাহ হইতে এই শান্ত আত্ম-ভোলা মানুষটিকে অব্যাহতি দিতেই বোধ করি কমললতা পলাইতে চায়।... [শ্রীকান্ত : ৪র্থ পর্ব্ব, ৮ম পরিচ্ছেদ]

তবু শ্রীকান্তের সন্দেহ ঘোচে নাই, সে কমললতাকে বারবার

জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কমললতা শেষে তাহাকে বলিয়াছিল—"তোমার যা ইচ্ছে হয় ভাবো গে গোঁসাই, একদিন আপনিই তার জবাব পাবে।" শ্রীকান্ত যে তাহা পাইয়াছিল এমন বোধ হয় না। আমরা তাহা পাইয়াছি; কমললতার ঐ প্রেম—তাহার ইষ্ট দেবতারই আরাধনা; সে তাহার আত্মার সত্য, তাহাতে প্রেম ভিন্ন আর কোন ভাবের ভেজাল থাকিতে পারে না। অজ্ঞান পিপাসার (passion) মত উহা অন্ধও নহে; উহা যেন দেহেরই একরূপ spiritual বা দেহাতীত ক্ষুধা। ইহাই প্রকৃত 'free love,'—কোন বন্ধন মানে না—দয়ার বন্ধনও নয়; তাই গহরকে সে দয়া করিতেও পারে না, করিলে নিজের প্রতিও যেমন, গহরের প্রতিও তেমনই মিথ্যাচার করা হয়; কারণ, গহরের সত্যও তাঁহার আত্মার সত্য।"

চার

কমললতার-দুই চরিত্র

"Lily-like, white as snow,
She hardly knew
She was a woman, so
Sweetly she grew"

মুরারীপুরের বৈষ্ণব আখড়ায় বোষ্টুমী কমললতার মধ্যে-দু'টো স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে। একটা প্রভাত—অন্যটি সন্ধ্যা ঝটিকা বিক্ষুব্ধ রজনীতে নীড়হারা পাখির মত যে নারী তার যুবতী জীবনের সকল কিছু ফেলে রেখে অচেনা—অজানার অভিসারে যাত্রা করেছিল—একদিন বোধ হয় এক মেঘমুক্ত দিনে সে এই আখড়ায় শান্তির স্নিগ্ধ স্পর্শ পেল। এটা কি সত্যি—না এর মধ্যে তার অন্তরের গভীরে এক মানসিক দ্বন্দ্ব বর্তমান আছে। দ্বন্দ্বটা কি ? পাপ। সনাতন ধর্ম পাপকে স্বীকার করেনা। বৈষ্ণব ধর্ম, ইসলাম ও বৌদ্ধ ও খ্রীষ্ট ধর্ম পাপকে স্বীকার করে ও এই Sin' বলে শব্দটি নর-নারীকে অহর্নিশি বিবেকে দংশন দিচ্ছে। এ দংশন জ্বালা শরৎ সাহিত্যের পাতায় পাতায়—পিয়ারীবাঈ রাজলক্ষ্মী হয়ে ও তা ভুলতে পারেনি। সমাজত্যাগিনী অন্নদাদি, সাবিত্রী, কিরণময়ী অচলা, জ্ঞানদা সবারই তো পদস্খলণ হয়েছে। কিন্তু সবাই ভীতা-চকিতা জর্জরিতা। কিন্তু কমললতার মধ্যে তা দেখি না। সে confess করেছে এক মাত্র শ্রীকান্তের কাছে। আর কারুর কাছে নয়। এই confessই তো তার ট্র্যাজেডী। তার অবচেতন মনবৃত্তি চেতন হল হঠাৎ করে শ্রীকান্তের সান্নিধ্যে এসে। কেন হল—তা বুঝতে গেলে জানতে হবে শ্রীকান্তকে।

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' এক অবিস্মরণীয় কীর্তি তাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এই 'শ্রীকান্ত' নামক পুরুষটি শরৎ সাহিত্যের আর আর নায়কের মতই—শুধু দেনাপাওনার জীবানন্দ ছাড়া।

শ্রীকান্ত ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে, ছন্নছাড়া—ছিঃ ছিঃ তার গঞ্জনা জীবণ ভর। তবু শ্রীকান্ত-শ্রীকান্ত—নতুনদা যতই বলুন ছিরিকান্ত। শ্রীকান্ত-চতুর্থ পর্বে দেখি:—

"এতকাল জীবনটা কাটিল উপগ্রহের মত। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরি, না পাইলাম তাহার কাছে আসিবার, না পাইলাম দূরে যাইবার অনুমতি। অধীন নই, নিজেকে স্বাধীন বলারও জোর নাই।"

এখানেই শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের চরিত্র সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ সে বাউণ্ডুলে, ভবঘুরে নয়। সে রাজলক্ষ্মীর উপগ্রহ-মাত্র। আর সে যে যত্র-তত্র বিচরণ করে-সেটা তার স্কন্ধে নিয়তি ভর করেছে বলেই। শ্রীকান্ত সৎ, সরল, মানবতাবাদী, পরদুঃখকাতর ও সর্বোপরি ধীর স্থির। কিন্তু প্রকৃত পুরুষ বলতে যা বোঝায় তা নয়।

শরৎচন্দ্র যদি 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থের চারটি পর্ব্বকে ভ্রমণ কাহিনী বলে মনে করে থাকতেন-তা ভুল। আবার উপন্যাসও নয়। এ-হল এক 'নভেলা' বা কতগুলি চরিত্র শরতের ভাসমান খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘের মত স্বচ্ছ হয়ে দেখা দিয়েছে-এবং সবকটা চরিত্রই পৃথক। আর শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী হল প্রধান নায়ক নায়িকা— যা ভ্রমণ কাহিনীতে এমন ভাবে থাকে না। তাছাড়া ভ্রমণ কাহিনী কখনো Subjective হতে পারে না। এখানে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী উভয় Subjective। শ্রীকান্তের চারটে পর্বে আমরা যা পেয়েছি তা Bernard Shaw এর ভাষায় বলা চলে—" Here, then, was the higher but vaguer and timider version, the incoherent, mischievous, and even ridiculous unpracticalness, which offerd me a dramatic antagonist for clear, bold, sure, sensible, benevolent, salutarily shortsighted christian Socialist idealism'.

প্রকৃত শিল্পী শরৎচন্দ্রের কাছে এটা মহৎ শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে—কিন্তু কোথায় যেন একটা খট্‌কা লেগে থাকে—সেটা এত বড় সাহিত্যকৃতিতে প্রকৃত পুরুষ কোথায়? তবু শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব বারম্বার পাঠ করে মনে হয়—

"That book ın many eyes dolh share the glory
That in gold clasps locks in the golden story
So shall you share all that he dolh possess,
By having him making yourself no less."

'শ্রীকান্ত' তো mistic নয়—একটা Metaphysical চরিত্র। এবং Helen Gardner এর ভাষায় বলা চলে, "He affects the metaphysics, not only in his satires, but in his amorous verses, where nature only should reign., and perplexes the minds of the fair sex with nice speculations of philosophy, when he should engage their hearts, and entertain them with the softnesses of love."

শ্রীকান্ত কি জাতীয় নায়ক তা জানতে গেলে আমাদের রাজলক্ষ্মী ও কমললতার দুয়ারে ধর্ণা দিতে হবে। কারণ সমস্ত জীবন ভর যে ব্যর্থতার মৃত আলবাট্রসের বোঝা ছাড়া আর কিছু নয়—তাকে বিস্তৃতির অবকাশ দেবার স্থান কোথায়। আর ঐ যে Fate—সে তো তাকে The Anatomy of Melancholy'র পর্য্যায় ফেলেছে।

এখানে আমাদের একবার সংস্কৃত সাহিত্যের অলংকার শাস্ত্রের কাছে এসে দাঁড়াতে হবে। কারণ যাচাই করে দেখতে হবে শ্রীকান্ত কোন শ্রেণীর নায়ক।

সাহিত্য দর্পনে দেখি :—

"ত্যাগী কৃতী কুলীনঃ সুশ্রীকো রূপযৌবনোৎসাহ।
দক্ষোহনুরক্তলোকস্তেজোবৈদগ্ধ্যশীলবান্ নেতা॥"

অর্থাৎ দক্ষঃ ক্ষিপ্রকারী। শীলং সদ্‌বৃত্তম্। এবমাদিগুণসম্পন্নো নেতা নায়কো ভবতি।

সাহিত্য দর্পন-কার আবার বলছেন :—

"ধীরোদাত্ত ধরোদ্ধতস্তথা ধীরললিতশ্চ ।
ধীরপ্রশান্ত ইত্যয়মুক্তঃ প্রথমশ্চতুর্ভেদঃ ॥"

ধরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত ও ধীরপ্রশান্ত—এই চাররকম নায়কের মধ্যে আত্মশ্লাঘাহীন, ক্ষমাবান, অতি-গম্ভীর মহাসত্ত্ব, ধীর প্রকৃতি, বিনয়াচ্ছন্ন-গর্ব ও দৃঢ়ব্রত নায়ককে ধীরোদাত্ত নায়ক বলে। প্রতারক, উগ্রস্বভাব, চঞ্চল প্রকৃতি, অহংকার দর্পপূর্ণ, আত্মশ্লাঘাকারী নায়ককে ধীরোদ্ধত নায়ক বলে। নিরুদ্বেগচিত্ত মৃদুস্বভাব, সর্বদা নৃত্যগীতাদি কলাপরায়ণ নায়ক হল ধীরললিত।

শ্রীকান্তের মধ্যে আমরা ধীরোদ্ধত ও ধীরললিত মিশ্রিত নায়ককে পাই। শ্রীকান্তের চরিত্রে যে উদাসীভাব সেটা যেন বাংলা দেশের বাউল বা সুফী ভাব বলে মনে হয়। কিন্তু ব্যর্থতার বোঝার জন্য যে পদে পদে নিজেকে ধিক্কার দেয় যে আপন আবেগে আপন প্রচেষ্টায় উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরু পাড়ি দিতে অপারগ, যে কোন বিশেষ ধর্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে সন্দেহবাদী, যে নারীদের সঙ্গে কথোপকথনে ব্যাকুল সে হেন নায়ক শ্রীকান্ত বাউল বা সুফী নয়। আমরা আগেই বলেছি শ্রীকান্ত হল রাজলক্ষ্মীর উপগ্রহ মাত্র। D. H. Lawrence তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন,

The pure male is himself almost an abstraction, almost bodiless like Shelley or Edmund Spenser. But, as we know humanity, this condition comes of an omission of some vital part. In the ordinary sense, Shelley never lived. He transcended life. But we do not want to transcend life, since we are of life."

শ্রীকান্ত যেন এক চপল বালক। এবং সব কিছু জানবার ও শোনবার ব্যগ্রতা দেখবার মত। কিন্তু সে দেখাতে চায়—সে তা নয়। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে সে পাঠকদের মধ্যে ধরা পড়ে গেছে। তবে শ্রীকান্ত একটা জিনিসে খুবই উচ্চাঙ্গের পুরুষ তা হ'ল

মানবতাবাদী ও পরদুঃখকাতর। নবজাগৃতির এই বিশেষ প্রভাব তার উপর পতিত হয়েচে—তার মধ্যে মধ্যযুগের সৃষ্ট হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামী নেই—কিন্তু যীশু বা বুদ্ধের অমর বাণী তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে অনেকখানি। এখানেও Lawrence-এর কথা প্রণিধানযোগ্য :—

"A man who is well balanced between male and female, in his own nature, is as a rule, happy, easy to mate, easy to satisfy, and content to exist. It is only a disproportion, or a dissatisfaction, which makes the man struggle in to articulation. And the articulation is of two sorts, the cry of desire or the cry of realisation, the cry of satisfaction, the effort to prolong the sense of satisfaction, to prolong the moment of consummation,"

এহো বাহ্য। শ্রীকান্ত কিন্তু কারুর উপর বিন্দুমাত্র ক্রোধ বা ঘৃণা পোষণ করেনি। যদি সেটা হয়ে থাকে তা মুহূর্তের জন্যই।

এখানে একটা প্রশ্ন সচরাচর আমাদের মনে জাগে। শ্রীকান্ত কি সীমার মাঝে অসীমের সুর বাজাতে চেয়েছেন—না তার প্রেমও সে নিজের সম্পর্কে বলতে চেয়েছে—

"তুমি প্রশান্ত চিরনিশিদিন
আমি অশান্ত বিরামবিহীন
চঞ্চল অনিবার—
যতদুর হেরি দূরদিগন্তে
তুমি আমি একাকার।"

না রাজলক্ষ্মীর সোহাগের স্রোতে নিরুপায় হয়ে ভেসে চলেছে। এ সব প্রশ্নের একমাত্র উত্তর রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত শত প্রেমিকের মাঝে খেলা করেছে। কিন্তু আবার প্রশ্ন ওঠে—তবে কি সে কমললতার কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করেনি? না করলে সে কমললতার কাছে একদিনের বেশী থাকলো কেন? এবং সকালে যাবো না বিকেলে যাবো—বিকেলে যাবো না সকালে যাবো—এসব

চাতুরী করল কেন? সে কি কমললতাকে শুধু মাত্র যাচাই করবার জন্য। না কমললতাকে দেখে বা তার কথা শুনে মনে হল—

"News from a foreign country came,
As if my Treasure and my Wealth lay there:
So much it did my Heart Enflame!
Twas wont to call my soul into mine Ear.
Which thither went to meet
The Approaching sweet."

তবু একটা সত্য শ্রীকান্তের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে উদ্‌ঘাটন হয়েছে। সে 'ভাল্‌গার' নয় আবার 'Superman'ও নয়—আবার 'সিনিক'ও নয়। কিন্তু অনেক কথা—যা কমললতাকে বলা চলে না, রাজলক্ষ্মীকে বলা চলে—সে কথা রাজলক্ষ্মীকে বলে নি।

"সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রত্যাবর্তন করিলাম, গিয়া দেখি সেখানে সমারোহ ব্যাপার। ঠাকুর ও ঠাকুরঘর সাজান হইতেছে, আরতির পরে কীর্তনের বৈঠক বসিবে।

'বস্তুতঃ বৈষ্ণব-কবিদের পদাবলীর মত মধুর বস্তু আমার আর নাই। কমললতা, তুমি গাইবে না আজ?" রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বলে, 'তুমি কীর্ত্তন শুনতে এত ভালবাস, কই আমাকে ত সে-কথা বলোনি?"

অবশ্য এর পর অনেক সংলাপ হল। কিন্তু মনে হচ্চে কমললতার প্রতি একটা আসক্তি জন্মেছে শ্রীকান্তের। রাজলক্ষ্মী জেনেও জানবার চেষ্টা করেনি—

"ভেতর দুয়ার বন্ধ আজিকে
বাহির দুয়ার খোলা।"

শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শ্রীকান্তকে এক আদর্শ চরিত্ররূপে অঙ্কিত করবার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ শরৎ সাহিত্যে স্বভাবতঃ যে পুরুষ বিদ্বেষী মনোভাব আমাদের মনকে আন্দোলিত করে----যেমন মোঁপাসা, চেখভ, টলষ্টয়, হার্ডি, সমারসেট মম বা

কেম্যুর মধ্যে দেখি----শরৎ-সাহিত্যে তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম নেই। তবু শরৎ সাহিত্যের 'শ্রীকান্ত' ফুটোতে গিয়ে মনে হয় তিনি বারম্বার ফ্লবেয়র ও মেঁাপাসা পড়েছেন। শ্রীকান্তকে প্রকৃত Idialistic নায়ক বললে ভুল হবে। একটা পর্বত প্রমাণ sentiment নিয়ে শ্রীকান্ত উপগ্রহের মত রাজলক্ষ্মীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে ঘুরছে। এবং তার মধ্যে 'প্যাসান্' বা lustও আছে---সেটা অবশ্য খুবই সুপ্ত অবস্থায়। মাঠে-প্রান্তরে, শ্মশানে বা নদীর পারে ভ্রাম্যমান শ্রীকান্ত কবি হতে পারে কিন্তু নায়ক নয়। নায়কের চরিত্রে যে Man of action সেটা তার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায় নি। অবশ্য 'শ্রীকান্ত' চরিত্রের মধ্যে যে মানবতাবাদ ও কল্পনাপ্রবণ মনের বিকাশ ঘটেচে সেখানে রোমারেঁালার জঁা ক্রিস্তাফও হার মেনেছে। তার কারণ রোলঁার জঁা ক্রিস্তাফ্ বিশ্ব প্রেমিক, Humanist ও মহানায়ক। শ্রীকান্ত Humanist এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান এক বিপ্লবী পুরুষ—কিন্তু বিছানায় শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখা আর রাজলক্ষ্মীর আঁচল ধরে থাকা তার কাল। কিন্তু শরৎচন্দ্র বিংশ শতাব্দীর একজন সর্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। তাঁর 'শ্রীকান্ত' নায়ক বা অতিনায়ক নায়ক না হয়েও এমন একটা মন পেয়েছে—তাতে, করে সে নিজেই একটা 'কেন্দ্রবিন্দু' হয়ে উঠেছে। 'সৌন্দর্যের ধ্রুবত্ব চিরানন্দময়' এ কথা একমাত্র শ্রীকান্তের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। এবং উনবিংশ শতকের বাংলা নব জাগৃতির যে এক পলায়নীবৃত্তিভাব বহু মহাপুরুষদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে—তারই প্রতিচ্ছবি যেন শ্রীকান্ত।

'শ্রীকান্ত'কে দেখলে মনে হয় Lawrence-এর এক উপন্যাসের কথা—যে হেতু উভয়ই নারী দরদী।

"Ah well,' Sighed the doctor, 'Marriage is a mystery. I'm glad I'm not entangled in it,

Yes, to make some woman s life a misery. I'm sure it was death to live with him, he seemed to kill everything

off inside you. He was a man you couldn't quarrel with, and get it over quiet—quiet in his tempers, and selfish through and through. I've lived with him twelve years—I know what it is. Killing! you don't know what he was." বিনা দ্বিধায় আমরা বলতে পারি—শ্রীকান্তের চরিত্রে এক নতুন সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে—যা বিশ্বের কোন পুরুষ চরিত্রে প্রকাশ পায়নি। শ্রীকান্ত চিন্তানায়ক নয়, ভক্তিবাদী, গুরুবাদী নয়, রাজনীতিজ্ঞ নয়, শিল্পী নয় সঙ্গীতজ্ঞ নয়—তবু কিন্তু থেকে যায়। এই কিন্তুর উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের কমললতার স্মরণ নিতে হবে। আর দেখতে হবে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে সব চেয়ে কার প্রভাব পড়েছে। আমরা দেখি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণীই তাকে বেশী মাত্রায় উদ্বুদ্ধ করেছে

শ্রীকান্তের জেহাদ দুটো জিনিসেব বিরুদ্ধে। এক হ'ল ব্রাহ্মণতন্ত্রের সংকীর্ণতা, নিম্নকোটী সমাজের উপর পাশবিক উৎপীড়ন। দুই হ'ল বাংলার নারীত্বের উপর যে মিথ্যা অবমাননা চলছে তাকে ভাঙ্গবার প্রচেষ্টা। এই দু'টো জিনিসের শিক্ষা তিনি পেয়েছেন রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কাছ থেকেও সেটা ..তফলিত হল শ্রীকান্তে।

শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের Narrow of sence of beauty'কে গ্রহণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের অসীমত্বকে স্বীকার করেন নি—আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষার প্রতি দ্বিধাহীন শ্রদ্ধা থাকলেও তাকে প্রচার করতে সাহসী হন নি। এখানেই আশাবাদী শরৎচন্দ্র চূড়ান্তভাবে নিয়তিবাদী বা Fatalist হয়েছেন। এবং তিনি সেই চাপা ক্রন্দন ধ্বনি তুলেছেন শ্রীকান্তের মধ্যে। এটাই যেন শরৎ-সাহিত্যের মহৎ Art. যে Art আমরা রোলাঁ বা টলস্টয়ের মধ্যে দেখি না। রবীন্দ্রনাথও নৈব নৈব চ।

গুস্তাভ ফ্লবেয়র যে Naturalism-এর প্রধান ও প্রথম ঋত্বিক তাঁর কাছ থেকে এমিল জোলা, মোপাসাঁ, ন্যুট হ্যামসান্, বালজাক্

হার্ডি, গলস্‌ওয়ার্দি, ইবসেন্, টমাস্‌ম্যান্ থেকে শুরু করে কোমু, লরেন্স, জেমস্ জয়েস্, ফক্‌নার, হেমিংওয়ে, সাঁত্রে সবাই অগ্নি নিয়ে সাহিত্যের অগ্নিহোত্রী হলেন। ভারতবর্ষে—অনেকে সেই যজ্ঞে হবিঃ নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র অদ্বিতীয়। সেটা শ্রীকান্তের মধ্যে সর্বতো ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

শ্রীকান্ত যে রাজলক্ষ্মীর প্রেম-সাগর স্নাত—সেই রাজলক্ষ্মী হ'ল পিয়ারী বাঈজী। পতিতাও বলা চলে—সমাজে সে অপাংক্তেয়। কিন্তু এই কি তার পরিচয়? তার পরিচয় সে শ্রীকান্তের দয়িতা শুধুমাত্র নয়—সে কায়মনবাক্যে তাকেই ভালবাসে। এখানে শ্রীকান্ত কিন্তু প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছে। সমাজ বড় না —মানবিকতা বড়। নারীত্ব বড় না সতীত্ব বড়। এ-সকল প্রশ্নের মীমাংসা কিন্তু শ্রীকান্ত করতে পারে নি। বাঙ্গালী সমাজের তথাকথিত 'The great tradition' কে ভাঙ্গতে শ্রীকান্ত পারল না। শ্রীকান্ত যদি আউল, বাউল বা সুফী বা বৈষ্ণব হত মনেপ্রাণে —তা হলে বুঝতো—

"   ার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

হয়তো শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের মধ্যে এই গূঢ় তথ্যটিকে গোপন রেখেছেন—তাই লরেন্সের মত তিনিই আমাদের কাছে ভুল বোঝা-বুঝির ব্যাপার হয়েছেন। F. R. Leavis লরেন্স সম্পর্কে লিখতে গি... বলেছেন—"Yet it remains true the failure of criticism and of the cultivated in respect of lawrence, the long unchecked prevalence of misrepresentation and malic, is a disgraceful chapter of English literary history."

শরৎচন্দ্র কি শ্রীকান্তের মুখ দিয়ে 'জীবনস্মৃতি' বলতে বসেছেন না ক্ষয়িষ্ণুবঙ্গের দৃশ্যকাব্য তুলে ধরতে চেয়েছেন! এ-প্রশ্নের উত্তর নেই। 'উত্তর শ্রীকান্ত কে বিশ্লেষণ করা।

শ্রীকান্তের মধ্যে ফুটে উঠেছে এক অসহায় ভাব। তা হল, সে

একটু মেয়ে ঘেঁষা—এটাকে আমরা বলতে পারি 'কলির কেষ্ট'— কিন্তু সমালোচকের ভাষায় বলব Reaction. যে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর নিবিড় বন্ধনে বন্দী—সে হঠাৎ কমললতার হাতে ধরা পড়ল। এই ধরা পড়ার মধ্যে—দেখি নাগিনীর মত কমললতা শ্রীকান্তকে বশ করেছে। তবে সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু কমললতার বেষ্টন থেকে সে সহজে মুক্ত হতে পারছে না। শ্রীকান্তের নিভৃত অন্তরলোকে অধিষ্ঠিতা হয়েছে কমললতার একান্ত প্রেমস্পর্শ। তাই সে মুরারীপুর আখড়া ছেড়ে যেতে চায় না। আজ যাই কাল যাই বলে—কয়েকটি দিন কাটাল।

"——আজ সকালে আমার যাবার ইচ্ছা নাই।"

"নেই? তা হলে আর একটু ঘুমোও। উঠলে আমাকে খবর দিও—কেমন?"

কিন্তু শ্রীকান্ত আর কি নিদ্রা যেতে পারে। সে যে রসিকা কমললতার রসে সিক্ত হতে চলেছে।

শ্রীকান্ত বললে—"বলিলাম, আর শোব না কমললতা, চল তোমার সঙ্গে গিয়ে ফুল তুলে আনি গে।

বৈষ্ণবী কহিল, তুমি স্নান করোনি, কাপড় ছাড়োনি, তোমার ছোঁয়া ফুলে পুজো হবে কেন?

বলিলাম, ফুল তুলতে না দাও, ডাল নুইয়ে ধরতে দেবে ত? তাতেও তোমার সাহায্য হবে।"

শ্রীকান্ত আরো বলল। "বলিলাম, অন্ততঃ সঙ্গে থেকে দুটো সুখদুঃখের গল্প করতেও পারব ত? তাতেও তোমার শ্রম লঘু হবে।

এবার বৈষ্ণবী হাসিল, কহিল. হঠাৎ বড় দরদ যে গোঁসাই—আচ্ছা চলো……"।

গহর হ'ল শ্রীকান্তের বাল্য বন্ধু। তাকে ভুলে সে বৈষ্ণব আখড়ায় দিন কাটাচ্ছে কিসের মোহে? সে কি পুণ্য করবার লোভে—না বৈষ্ণব ভক্ত হয়েচে? শ্রীকান্ত ধার্মিক—ভগবৎ বিশ্বাসী এ-কথা

শরৎচন্দ্র কোথাও প্রমান করবার চেষ্টা করেন নি। এবং Paganism-এর উপর শ্রদ্ধা ভাবটা তার খুবই কম। তবু সে ঠাকুরের কাপড় গোছানো থেকে—ফুল তোলা—মালা গাঁথা ইত্যাদি করল কার জন্য? কমললতার প্রতি অকুণ্ঠ দরদ। এবং এই দরদের মধ্যে কামনা-বাসনার যে স্পৃহা নেই তা বলা চলেনা। কমললতার প্রতি শ্রীকান্তের যে মৃদু-মন্দ ভালবাসা—তা রজকিনী রামীরনিকষিত হেম-তুল্য প্রেম নয়—এবং কামগন্ধ নেই বলা চলে না। তবে কমললতার কাছে শ্রীকান্ত ধরা পড়ে গেছে।

পাঁচ

কমললতার জীবন দর্শন

"চণ্ডিদাস বাণী শুন বিনোদিনী পীরিতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পীরিতি মিলায় তথা।"

এইবার আমরা কমললতার দিকে ফিরে চাইব।

হরিভক্তি পরা যে চ হরিণামপরায়ণাঃ।
দুর্ব্বৃত্তা বাসুবৃত্তা বা তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ॥

এতক্ষণ শ্রীকান্ত-চরিত্রের কিছু কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করলাম। কিন্তু শ্রীকান্তকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে— আমাদের জানতে হবে কমললতাকে। কমললতার মধ্যেই প্রতিবিম্বিত হয়েছে শ্রীকান্ত যা রাজলক্ষ্মীর মধ্যে হয় নি। আমরা যখন এই বোষ্টমী যুবতীকে মুরারীপুর আখড়ায় দেখি তখন মনে হয় এই নারী জীবন-যৌবন রসের ভিয়েন চাপিয়েছে মাত্র এক জনের জন্য তাকে দেখলে মনে হয় সে তার আয়ত চক্ষুদ্বয় উন্মীলন করে আছে এক দিকে। তা হ'ল—

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদ কমলং
শ্রীগুরাণ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপ সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং
কৃষ্ণ চৈতন্যদেবং শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্
সহস্র গণ-ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥"

হয়তো বা আরো কিছুদূর অগ্রসরমানা কমললতা হরিভক্তি, প্রেমভক্তি, নরভক্তি ও রসভক্তি হয়ে দেখা দিয়ে বলতে পারে:— "যদি কেহ শ্রীহরির শ্রবণ-মনণ সংকীর্তন ও ভক্তিদ্বারা পরমপুরুষার্থ-

স্বরূপ কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে অপার প্রেমসুধা সিন্ধু রস-রহস্যরূপ শ্রীগৌরাঙ্গধাম আমার কি পরম নমস্য!

এখন প্রশ্ন ওঠে যুবতী সুন্দরী জীবন যৌবন সব নরপাদপদ্মে বিসর্জন বিমুখ সত্যি কিনা? এবং সে বৈষ্ণব সাধনায় প্রকৃতপক্ষে ব্রতী হতে পেরেছে। না, এটা তার আত্মগোপন করবার একটা প্রচেষ্টা মাত্র। কমললতার জীবনকে বীতস্পৃহ করেছে মন্মথ। কমললতা এক নব উন্মাদনায় তার বৈধব্য যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে মন্মথের কাছে আত্মসমর্পণ করে জননী হতে চেয়েছিল—কিন্তু বিশ্বাসঘাতক অর্থলোলুপ কৃতঘ্ন পুরুষ মন্মথ তাকে শুধু বঞ্চনা করেনি—পুরুষ জাতের প্রতি একটা ঘৃণা ধরিয়ে দিয়েছে। তা যদি সত্য হয় তা হলে কমললতা যে ভক্তিবাদের মধ্যে নিজেকে নিয়োগ করেছে—তার মধ্যে গীতার ভক্তিবাদ কোথায়? এখানে দেখি তার 'প্রতি অংগ লাগি কাঁদে প্রতি অংগ মোর।' শ্রীকান্ত কমললতাকে চিত্রিত করেছে দুই প্রক্রিয়ায় যথা:—

"আধ-অঙ্গে পীতবাস আধ নীল সাড়ি।
আধ ভুজে বলয়া আধ ভুজে নীল চুড়ি॥
আধ অংগে হিলাহিলি ঘেরাঘেরি বাহু।"

এবং শরৎচন্দ্র পাঠকদের দেখাতে চেয়েছেন—

"দেখ সখি রাধা-মাধব সঙ্গ।
দুহু দুহু মিলনে আনন্দ বাঢ়ল
দুহু মনে উদিত অনঙ্গ॥
দুহু কর পরশিতে পুলকিত দুহু তনু
দুহু দুহু আধ আধ বোল।"

এখানে কমললতা সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতির। মধুকর যেমন কুসুম বিনষ্ট না করে মধু পান করে—তেমনি এই নারীর প্রকৃতি সেইরূপ। কমললতা তার দেহ ও মনকে উপভোগ করতে দিতে চলেছে শ্রীকৃষ্ণের পদতলে এবং ঐ মূর্তি তার সঙ্গে এমন ভাবে

মিলিত হবে যে ভক্তকে আহ্বান না করলেও সে তার অনুগামিনী হবে।

কমললতার জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে ছায়া ও কায়ায় তার চরম বিতৃষ্ণা। তাই এক পাষাণ মূর্তির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে বলতে চায়

"বঁধূ কানাই কহিলে বসিবা দুখ।
আর যত কুলবতী কুলের ধরম রাখি
সে জানি হেরয়ে তুয়া মুখ॥"
সহজে বরণ কলি তিমিরপুঞ্জ ভেল
অন্তর বাহির সমতুল।
মরুক তোমায় বোলে কলসী বাঁধিয়া গলে
সে ধনী মজাক জাতি কুল॥"

বা

ভাল হইল বঁধূ আপনা রাখিলে
কি আর ও সব কথা।
তোমার পিরীতি বুঝিতে না পারি
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা॥"

কিন্তু এতেও বোঝা গেল না কমললতাকে। তাকে বুঝতে গেলে তার কথার মধ্যে দিয়েই বুঝতে হবে। বোষ্টমী তার একটা কথার মধ্যে দিয়ে তার মনের ভাব ব্যক্ত করতে চেয়েচে।

"বোষ্টমীর জাল ছিঁড়ে হঠাৎ বার হওয়া যায় না, তোমাকে সাবধান করে দেয়নি ?"

অর্থাৎ কমললতা কি সত্যি বোষ্টমী না কামাক্ষাদি তন্ত্র-মন্ত্র-সিদ্ধা নারী? অবশ্য শ্রীকান্ত নিজেই এ প্রশ্নের মীমাংসা করে দিয়েছে।" বিশেষজ্ঞদের মুখে শুনিয়াছি, বাঙলা দেশের আধ্যাতিক সাধনার নিগূঢ় রহস্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েই সুগুপ্ত আছে এবং সেইটাই নাকি বাঙ্গলার নিজস্ব খাঁটি জিনিস।" আমরা জানি বাংলা দেশে

চৈতন্যদেব তাঁর অগণিত ভক্তবৃন্দকর্তৃক সাক্ষাৎ কৃষ্ণ রূপে পূজা পান। এবং তিনি বিশুদ্ধ মাধুর্যগুণোপেত প্রেমধর্ম প্রবর্তিত করে আপামর জনতাকে ভক্তিবাদে মত্ত করেন। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ফলে স্ত্রীজাতি ও তথাকথিত নীচ বর্ণের ব্যক্তিরা নূতন সামাজিক মর্যাদা লাভ করেন।

কমললতাকে বুঝবার আগে আমরা 'ভক্তিবাদ' সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই।

"ভজ্" ধাতু থেকে ভক্তি শব্দের সৃষ্টি। মধুসূদন সরস্বতীমতে ভক্তিশব্দ ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ ভজন। হৃদয়ের নিভৃতস্থানে ভগবানের অবস্থিতি। আবার যার দ্বারা অন্তঃকরণকে ভগবদাকারে আবরিত করা যায়—এই কথায় করণবাচ্যে 'ভক্তি' শব্দ গ্রহণ করা চলে। অর্থাৎ সাধন, শ্রবণ কীর্তনাদি।

ভক্তির অর্থ প্রকাশ করতে শাণ্ডিল্যসূত্রে আছে—'সা পরাণুরক্তিরীশ্বরে' মানে ঈশ্বরের প্রতি পরম অনুরাগই ভক্তি। নারদ ভক্তিসূত্রমতে 'সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা, অমৃতস্বরূপা চ, যল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি।'' ভক্তিবাদের মধ্যে অদ্বৈতবাদ; শূণ্যবাদ পাওয়া যায় না। ভক্তিবাদের খাঁটি কথা 'চিনি হতে চাই না গো মা, চিনি খেতে ভালবাসি।' একেই ভক্তিবাদের মূলকথা বলা চলে। শাক্তরা বলেন—দেবী সর্বশক্তিময়ী, তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য থেকে তাঁকে আলাদা রূপে কল্পনা করা চলে না। বৈষ্ণবরা বলেন, ভগবানের ঐশ্বর্য অনন্ত কিন্তু সেই ঐশ্বর্যের বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকা পর্যন্ত সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর রতির উৎপত্তি হতে পারে না। মাতার কাছে ধন, রূপ, যশ প্রভৃতি প্রার্থনা করা চলে, বালগোপালের কাছে তা করা হাস্যকর। বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্বের মূল কথা হল—ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ, রসস্বরূপ কিন্তু রসাস্বাদন করতে হলে ভক্তের কাছে তাকে আসতে হবে। অর্থাৎ বৈষ্ণবের কথায় 'জ্ঞানের অগম্য তিনি প্রেমের ভিখারী।' রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন:—

'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হতো যে মিছে।'

বৈষ্ণব ধর্মে এই ভক্তিবাদ এসেছে খৃষ্ট ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও ইসলামের সুফীবাদ থেকে। এবং কমললতার মধ্যে তা প্রত্যক্ষভাবেই ফুটে উঠেছে। তবে কমললতার ভক্তি সাধ্য না সাধনা? বৈষ্ণবরা বলেন, ভক্তিই সাধ্য, এবং পঞ্চমপুরুষার্থ। বিষ্ণুপুরাণে আছে, সমস্ত কর্ম ও সাধনের সেই পর্যন্ত অপেক্ষা, যাবৎ আত্মরূপী ঈশ্বরে বিশুদ্ধা রতি না জন্মায়।

কমললতার ভক্তি রহস্য দ্বার উদ্ঘাটন না করলে তার চরিত্রের মাধুর্য উপলব্ধি করা যাবে না। শ্রীকান্ত হল—'হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি, মন নাহি মোর কিছুতেই''—সে-সত্য ধরা পড়েছে কমললতার কাছে।

বৈষ্ণবী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, নবীন হুঁসিয়ার মাঝি। তার কথা না শুনে ভালো করোনি।

কেন বল ত?

বৈষ্ণবী ইহার জবাব দিল না, গহরকে দেখাইয়া কহিল, গোঁসাই বলে, তুমি বিদেশে যাচ্চ চাকরি করতে। তোমার ত কেউ নেই, চাকরি করবে কেন?

তবে কি করব?

আমরা যা করি। গোবিন্দজীর প্রাসাদ কেউ আর কেড়ে নিতে পারবে না।

তা জানি। কিন্তু বৈরাগীগিরি আমার নতুন নয়।

বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল, তা বুঝেচি, ধাতে সয় না বুঝি?

না, বেশীদিন সয় না।

বৈষ্ণবী মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, তোমার কমই ভাল। ভেতরে এসো, ওদের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিই। এখানে কমলের বন আছে।

তা শুনেচি। কিন্তু অন্ধকারে ফিরব কি করে?

বৈষ্ণবী পুনশ্চ হাসিল, কহিল, অন্ধকারে ফিরতেই বা আমরা দেব কেন? অন্ধকার কাটবে গো কাটবে। তখন যেয়ো। এসো।

চলো।

বৈষ্ণবী কহিল, গৌর! গৌর!

রসতত্ত্ব ও গৌরতত্ত্ব না জানলে আবার কমললতাকে বোঝা দুষ্কর।

গৌর মানে গোরা চাঁদ—মানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। পূর্ণ ভগবান। এই শচীর নন্দনের দিকে চেয়ে বৈষ্ণবরা গান:—

নীরদ নয়ানে নব ঘন সিঞ্চনে
পূরল মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকসিত ভাব-কদম্ব॥
কি পেখলু নটবর গৌর কিশোর
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে-উজোর॥"

আবার কেউ কীর্তন করেন—

"কাঞ্চন কিরণ গৌর তনু মোহন
প্রেমে আকুল দুই নয়ন ঝরে।
করিবর সুবলিত আজানুলম্বিত
ভুজযুগ শোভিত পুলকভরে॥
জয় শচীনন্দন গোরাঙ্গ নাম।
জগত্তারণ কারণ ধাম॥

হরি-গুণ-কীর্ত্তন প্রকট অনুক্ষণ
নাহি পরাভব ভরে।
শিব-শুক নারদ ব্যাস বিশারদ
অনুক্ষণ রঙ্গে সঙ্গে ফিরে॥"

গোপীজনবল্লভ নন্দনন্দন রাধানায়ক নাগর শ্যামের জন্য শচী-নন্দন নদীয়া পুরন্দর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগমনোমোহন হরি গান দ্বারা কলিযুগ কাল ভুজগ ভয় খণ্ডন করেছেন।

এ-হেন গৌর ভক্ত কমললতা।

কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তো নারীদের প্রতি বিশেষভাবে বীত-স্পৃহ ছিলেন। তাহলে কমললতা গৌরপদলোভী হল কেন? এর মূলে কমললতার আধ্যাত্মিক চেতন-রস না নারী-বিমুখতার জন্য তাঁর প্রতি আসক্তি। না—গৌর হ'ল—ধন্যবাদ বা Thank you?

আমাদের বিশ্বাস শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রায় রামানন্দের কাছে যে তত্ত্ব শুনে ভাববিহ্বল হয়েছেন—সেই জন্যই কমললতা গৌর-পথ-গামিনী। কারণ তার প্রথম যৌবন-পান মন্মথ নামক মদমত্তহস্তী কর্তৃক দলিত-মথিত। আর একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন:—তা হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাধাভাবদ্যুতিবলয় পুরুষ এবং:—

আপন মাধুরী চমকিত হেরি
রাধার পরাণ-নাথ।
এ হেন মাধুরী রাধিকা সুন্দরী
আস্বাদয়ে সখি সাথ॥
কত সুখে ভাসে না জানি কি রসে
প্রেমের সাগর-মাঝ।
এতেক ভাবিতে উছলিল চিতে
ক্ষণে না সহে ব্যাজ॥

রাধা-ভাবামৃতে আস্বাদিতে চিতে
আইলা গউড়মাঝ।
নবদ্বীপ সিন্ধু কুমুদিনী বন্ধু
উদয় যে দ্বিজরাজ॥
রাধা রূপ রস চিন্তিয়া উল্লাসে
ভাবিতে ভাবিতে মনে।
আনন্দে ভুলিল সেই রূপ ভেল
গউর হেমবরণে॥
গৌরাঙ্গী কালিয়া মিশাল হইয়া
গৌরাঙ্গী সরস ভেল।
কালিয়া ঢাকিয়া ব্যাপক হইয়া
নিজরূপ প্রকাশিল॥"

না কমললতা দেখলো—নাম মহাধন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পতিত উদ্ধারে যে হরিনাম গান করে সবাইকে কোল দিলেন—তাতে সেও উদ্ধার পাবে। কারণ—

"গৌর গুণধাম পূরাইতে কাম
হেন কি জগতে আছে।
দয়ার সাগর ত্যরিতে পামর
কভু নাহি আগে পাছে॥"

মুরারীপুরের বৈষ্ণব আখড়ায় রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি পূজিত হন এবং কমললতা সেখানেই মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছিল। 'দিয়েছিল' কেন বললাম—শ্রীকান্তকে পেয়ে তার ভাবান্তর হ'ল। এই ভাবান্তর অবশ্যই লক্ষ্যণীয়। কারণ কমললতা কে? সে স্বল্পশিক্ষিতা, বিধবা এবং কুলটা ছাড়া কিছু নয়। আবার সে সরলা—চপলা, বুদ্ধিমতী ভাবিকা যুবতী।

শ্রীকান্তের কমললতাকে শরৎচন্দ্র অতি সাধারণ ভাবে চিত্রিত

করতে গিয়ে অসাধারণ করে তুলেছেন। এবং সেদিকে তাকিয়ে মনে হয়ঃ—

"নামাকৃষ্টরসজ্ঞঃ শীলেনোদ্দীপয়ণ্ সদানন্দং।
নিজরূপোৎসবদায়ী সনাতনাত্মা প্রভুর্জয়তি॥"

নিখিলে অখিলে সদা সর্বদা মিলনের মাধুর্য-ভরা মহা উৎসব হচ্ছে। চলেছে দেহ-মন সফেন ক্রীড়া। সৌন্দর্য ও আনন্দের তরঙ্গ-স্রোত। উৎসব হচ্ছে দিবানিশি চতুর্দিকে—রূপের আনন্দ-মেলায় নরনারীর মনোবিনিময়ে, তনুযমুনার তীরে তীরে। এ-কথা বারম্বার মনে হয় কমললতার দিকে তাকালে। বোষ্টমী কমল-লতার দেহে-মনে-কথায় যে ভাব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে ফুটে উঠেছে—তা হ'ল—প্রকৃতি পুরুষের আদি অকৃত্রিম বিরহ-মিলন খেলা। প্রাণী রাজ্যের শ্রেষ্ঠ আনন্দ রতিরসাস্বাদনে—দয়িতা ও দয়িতের শৃঙ্গার-মদির মিলনের মধু—মহোৎসবে। এই আনন্দের সঙ্গে পৃথিবীর কোন আনন্দের তুলনা চলে না। পার্থিব এই আনন্দ সীমাহীন, অপরিমেয় ও অনির্বচনীয়। এইটাকে প্রকাশ করতে না পারলে কমললতাকে বোঝা যাবে না।

'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে 'বিভাব' আর কমললতার 'বিভাব মূলতঃ একই। শ্রীমতীর মনে ও হৃদয়ে মধুর-রস-সৃষ্টি হচ্ছে রতি আস্বাদনের জন্য এবং নায়ককে আকৃষ্ট করবার জন্য। কমললতার odject of love রাধামাধব—না শ্রীকান্ত সেটা বুঝতে হলে দেখতে হবে সে কোন পথ-যাত্রী। বিভাব, অনুভাব, সাত্বিক, সঞ্চারী, বা ব্যভিচারী ও স্থায়ীভাব ইত্যাদি যখন কার্যকারণ সম্পর্কে যুক্ত হয়, তখনই আস্বাদন করা চলে মধুর রতিরস। এই মধুররতি রসসিক্ত হয়েছে কমললতা। হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় 'উজ্জ্বল-নীলমণি'র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'আলম্বন' সম্পর্কে সুন্দর কথা লিখেছেন।

"উজ্জ্বলের আলম্বন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
আর কৃষ্ণপ্রিয়াগণ হয় আলম্বন॥"

নায়ক হলেন শ্রীকৃষ্ণ আর নায়িকা শ্রীরাধা ও অপরাপর ব্রজাঙ্গনা-যাঁরা কৃষ্ণপ্রিয়া।

বিভাবের প্রথম বস্তু আলম্বন, দ্বিতীয় উদ্দীপন। নায়িকার চিত্ত প্রথম বিমোহিত হয় নায়কের রূপে বা গুণে। চোখে ভাল লাগে, মনকে স্পর্শ করে, তাই হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় আবেগ, উদ্দীপনার তরঙ্গ উচ্ছ্বাস। অনুকূল দক্ষিণা পবনে মুকুলিত হয়ে ওঠে নারীচিত্ত। এই মুকুলিত হৃদয়াবেগের নামই পূর্বরাগ। পূর্বরাগ পরিণত হয় অনুরাগে। অনুরাগ সঞ্চারিত হলে দেহমন মিলন-পিয়াসী হয়ে ওঠে। রতিরসাস্বাদনের কামনায় উতরোল হয়ে ওঠে নায়িকার সারা সত্তা। এই পুষ্পিত চিত্তবেগ যখন আনন্দঘন স্থায়ি রসের সঞ্চার করে তখনই পরিণত হয় প্রেমে।

আলম্বনকে আশ্রয় করেই প্রেমের সূচনা হয়। তার পূর্ণতাও হয় সেই আলম্বনের বেদীতলে দেহমন পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে। মধুরা রতির সঞ্চার ও সম্ভোগ অধিকতঃ নির্ভর করে আলম্বন বা নায়কের চরিত্র ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর। নারী স্বভাবতঃ আত্ম-সমর্পণশীলা। কিন্তু পুরুষ তা নয়। পুরুষের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের উপর প্রেমের সার্থকতা বেশী নির্ভর করে। তাই রতিসম্ভোগের অনির্বচনীয় তথ্য অনুসন্ধান করতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে নায়ককে, তার ব্যক্তিগত চরিত্রের বিবিধ বৈশিষ্ঠ্যকে। অবশ্য নায়ি-কার চরিত্রও উপেক্ষণায নয়। নারীমনের গতি পুরুষমনের চেয়েও বিচিত্র। স্বভাব ও মানসিক বৈশিষ্ঠ্য অনুযায়ী পুরুষের চরিত্রকে যতভাবে বিশ্লেষণ ও বিভক্ত করা যায়, নারী চরিত্রের বিভাগ তার চেয়ে অনেক বেশী। অবশ্য এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে, রতি-বিলাসে পুরুষের অধিকার ও সুযোগ যত অবাধ, নারীর তত নয়। লোকভয়, সামাজিক অনুশাসন ও পারিপার্শ্বিক বাধা নারীর জীবনগতিকে পদে পদে শৃংখলিত করে। ফলে, নায়িকা-চরিত্র হয়ে ওঠে অধিক জটিল। অবস্থাভেদে তার চরিত্রগত

বিভেদ নিতান্ত স্বাভাবিক। তাই নায়িকা বিচিত্ররূপিণী।'

কমললতার বিয়ে হয়েছিল এবং সতেরো বছর বয়সে সে হয় বিধবা। আবার মন্মথের সঙ্গে তার কণ্ঠীবদল হয়। অবশ্য ঘর করেনি এই নারী—বোষ্টমী কমললতা পতিহীনা। কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে বিচার করি—সে সত্যই পতিহীনা কি না। পতি কে? শাস্ত্রমতে বা বেদোক্ত বিধানানুযায়ী যিনি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং লৌকিক সমাজবিধানে সেই কান্তার ভর্তার আসনে অধিষ্ঠিত, তিনি পতি।

আবার:—বিক্রমের দ্বারা ভীষ্মকরাজের পুত্র রুক্মিকে পরাজিত করে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে দ্বারকায় এনে উৎসবোচ্ছলিত পৌরমণ্ডল সমক্ষে তার পানিগ্রহণ করলেন। বেদোক্ত বিধান অনুযায়ী এখানে নায়ক রুক্মিণীর পতি।

আবার শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর সঙ্গে যুগলভাব অঙ্গীকার করে যজ্ঞভূমিতে দীক্ষা গ্রহণ করেন, দক্ষিণার্থ ধনদান করেন এবং নায়িকার সঙ্গে সম্ভোগশৃঙ্গারে রত হন। এই সহধর্মিনীসঙ্গবিহার ও ব্রত উদ্‌যাপন বিষয়ে তাই তিনি রুক্মিণীর পতি।

আবার—যে সব গোকুল কুমারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ভরে মহামায়ার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—

হে কাত্যায়নি। নন্দসুতকে যেন পতিরূপে পাই, এবং মনে মনে সেই সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন, বিধিমতে নন্দ তনয় তাঁদেরও পতি।

আবার রুক্মিণীর পাণিগ্রহণের পূর্বে যে ব্রজকুমারিকাদের সঙ্গে লীলাচ্ছলে মাধবের পরিণয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ধর্মতঃ শ্রীকৃষ্ণ তাঁদেরও পতি।

এই নিয়ম অবশ্য শুধুমাত্র কুমারী নায়িকাদের ক্ষেত্রে খাটে। লৌকিক বা সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পাদিত না হয়েও, যদি লীলাচ্ছলে কোন কুমারীর সঙ্গে নায়কের মাল্যদান, অঞ্চল-বন্ধন বা দেহ

বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে নায়ক সেখানেও ধর্মতঃ পতিরূপেই পরিগণিত। তবে কি কমললতা শ্রীকান্তকে উপপতিরূপে ভাবতে চেয়েছে। খুব সম্ভব না। উপপতি কে?

"ইহলোক পরলোক না করি গণন।
নিজ রাগে করে যেই ধর্মের লঙ্ঘন॥
পরকীয়া নারীসঙ্গে করয়ে বিহার।
সদা প্রেমবশ, 'উপপতি' নাম তার॥

আবার দেখি

"শৃঙ্গারের মাধুর্য অধিক ইহাতে।
উপপতি রসশ্রেষ্ঠ ভরতের মতে॥"

আবার

লোকশাস্ত্রে করে যাহা অনেক বারণ।
প্রচ্ছন্ন কামুক সাথে দুর্লভ মিলন॥
তাহাতে পরমা রতি মন্মথের হয়।
মহামুনি নিজশাস্ত্রে এইমত কয়॥"

এবার দেখতে হবে কমললতা কি প্রকার নায়িকা। সমালোচকদের মধ্যে অনেকে বলেন শ্রীকান্ত-চতুর্থপর্ব্ব যেন শরৎচন্দ্রের নিঃশেষিত প্রতিভা। তাই কমললতাকে সহকার বৃক্ষ করে শ্রীকান্ত উঠতে চেয়েছে। কিন্তু আমার মতে শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব তাঁর সামগ্রীক রচনার মধ্যে শুধু অসামান্য নয়—অনন্য-সাধারণ। বিশেষ করে এই পর্বের কমললতা চরিত্র।

পাঠকবৃন্দ, আমি কিন্তু এখনো আমার আলোচ্য পথ থেকে বিচ্যুত হইনি। অর্থাৎ শ্রীকান্তের কমললতা ও বৈষ্ণবতত্ত্ব নিয়ে পুরো কদমে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি।

বৈষ্ণব কবিদের কাছে বহুপ্রকারের নায়িকা আছে। যথা সামান্যা নায়িকা, মুগ্ধা, নববয়াঃ, নবকামা, রতিবামা, সখীবশা, সব্রীভরতি, প্রযত্না, রোষ-কৃষ বাষ্পমৌনা, মানে বিমুখী, মৃদ্বি, অক্ষমা, মধ্যা, সমানলজ্জামদনা, প্রদ্যোক্তারুণ্যশালিনী, প্রত্যুৎপন্ন-

মতি, মোহান্তস্মরতক্ষমা, মানে কোমলা, মানে কর্কশা, ধীর-মধ্যা, অধীর মধ্যা, ধীরাধীর মধ্যা. প্রগল্‌ভা, পূর্ণতারুণ্যা, মদান্ধা; উরুরতোৎসুকা, ভুরিভাবোদ্‌গম, অভিজ্ঞা, রসাক্রান্তবল্লভা, ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন হল মুরারীপুরের বোষ্টমী কোন জাতীয় নায়িকার মধ্যে পড়ে তা অবশ্য বিচার্য্য-বিষয়। কারণ কণ্ঠিবদলের কালে মন্মথ নামক খল পতিকে ত্যাগ করে কমললতা যে নয়নাভিরামা হয়ে আমাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হয়েছে—তাকে বৈষ্ণবশাস্ত্রের রস-বিচারে বিশ্লেষণ করা দরকার।

শ্রীকান্ত বা আমাদের কাছে কমললতা সামান্যা নায়িকা নয়। কারণ সামান্যা নায়িকা বেশ্যা মাত্র। সে নায়কের নিকট অর্থ চায় রতিরস ভোগের পর। নবীন (গহরের ভৃত্য) অবশ্য প্রথমে তাই ভেবেছিল।

কমললতা মুগ্ধাও নয়! কারণ নবীন বয়স, অল্পমাত্র কাম, রতি বিষয়ে অনাগ্রহশীলা, সখীদের অনুগতা, রতি ক্রীড়ায় লজ্জা, দয়িতার প্রতি নিবিড় যত্নশীলা, প্রভৃতি হল মুগ্ধা নায়িকার প্রতীক। নববয়াঃ ও নয়। কারণ নববয়াঃ হল "নায়িকার তনুদেশ থেকে শৈশবের অন্ধকার অপসৃয়মান। মেঘাবৃতাকাশে সূর্যে আত্মপ্রকাশ! নয়নদ্বয় তারকা চপল. বক্ষে দুই উদয়গিরি শোভিত হচ্ছে, অর্থাৎ বাল্যকাল তোমাকে বিদায় নিতে হবে। এখানে কমললতার বয়স ত্রিশের মতো। কমললতাকে 'নবকামা' রূপে নিশ্চয়ই বলবো না। অয়ি যুবতী। বৃদ্ধা আভীরবধূবৃন্দ ছলনার দ্বারা কৃষ্ণের সঙ্গে তোমার কন্দর্প-উৎসব-রসের প্রস্তাব করলে, তুমি, মধুর লজ্জায় অবনত মুখী হয়ে, দুই কানে হাত চাপা দাও; ছল করে, উল্লাসভরে বনমালা গাঁথতে মন দাও। বলো দেখি, তোমার হৃদয়মধ্যে এ কি নবতম রঙ্গ আবির্ভূত হল?

কমললতা রতিবামাও নয়। কারণ শ্রীকান্ত তো শ্রীকৃষ্ণের মতো বলেনি, সখা, একদা যমুনাতীরে পলায়নোদ্যতা তার হাত

ধরলে, ঈষৎ হাসি হেসে চপলনেত্রা হয়ে আমাকে বলেনি—প্রাণনাথ, আমার হাত ছাড়ো। শ্রীকান্তের মনে একবার উদয় হয়েছিল—সে কমললতার হাত ধরে।

সে কি সখীবশা। অর্থাৎ—অভিসারিকা শ্রীমতী রাধিকাকে বাহুপাশে বন্দী করবার জন্য উদ্যত হয়ে কৃষ্ণ হাত বাড়ালে—ললিতা বলেছিল—কোন সুদক্ষ ব্যক্তি করীর করাল কবলে কোমল কমল-মৃণাল সমর্পণ করে? হে ব্রজরাজ, তোমার কর্কশ হস্তে সুকুমারী রাধিকাকে কিছুতেই তুলে দেব না।

কমললতাকে 'সব্রীড়তি-প্রযত্না' নায়িকা কিছুটা মনে হয়। কারণ তার লাস্যময়ীহাসি ও বাকচাতুর্য ও লজ্জা-জড়িত রতিপ্রয়াস শ্রীকান্তের অন্তর হরণ করেছে। শ্রীকান্ত যে এক রাতের নাম করে বেশ কয়েক রাত ঐ বৈষ্ণব আখড়ায় কাটালো—তা দেখে কি পাঠকদের মনে হয়—

"কুঞ্জকি নিকটে আসি পদ দুইচারি নাগর মিলন আসে,
কল্পিত অঙ্গরঙ্গ করি ফিরল ধৈর্য লাজবিলাসে।
সখিগণ সাধ সেজপর নেওল নাগর আস করু কোর।
রাধা মাধব কুঞ্জ ভবন মাঝে দুঁহু রহু আনন্দ ভোর॥"

শ্রীকান্তের প্রকৃত প্রেমিকা হল রাজলক্ষ্মী—একথা জেনেও রাজলক্ষ্মীকে দেখেও কমললতা তো রোষ-কৃতবাস্পমৌনা হয়নি। যেমন রাধাকৃষ্ণের লীলায় দেখি—"হে কদম্ববনভুজঙ্গ। তুমি অদক্ষিণ। তোমার অন্যায় সপ্রমাণ—তাই প্রিয়া রোষবশে বাস্প-মৌনা হয়ে আছে। সে তোমার সঙ্গে কোন বাক্য বিনময় করবে না। বস্ত্রাঞ্চলে বদনাবৃত করে ক্রন্দনমুখরা সে—তাকে কাঁদতে দাও। আর বৃথা কষ্ট বা পীড়া দিওনা।

তবে কমললতার মধ্যে দেখি 'মানে বিমুখী'।

"মানেতে বিমুখ হয় দুই ৩ প্রকার।
কেহ নাহি সহে মান, কেহ মৃদ্বী আর॥"

এইবার বোধ হয় কমললতাকে বাগে পেয়েছি। 'মৃদ্বি' নায়িকার স্বরূপ তার মধ্যে ধরতে পেরেছি। অর্থাৎ মৃদ্বী বা মৃদুস্বভাবা নায়িকা প্রিয়তমের প্রতি অভিমাণী হলেও নিষ্ঠুর হতে পারে না। কঠিন কথা উচ্চারণ করতে অপারগ হয়। তার জিহ্বাতে মধুর বাক্য ক্ষরিত হয়। ভ্রূকুটি করতে গিয়ে, নয়ন বিহ্বল দৃষ্টিতেই চেয়ে থাকে। দূরে সরে যেতে গেলে—চরণ তুলতে পারে না। তার উপর দেখি 'মোহান্ত-সুরত-ক্ষমা' ভাবও ধরা পড়ে।

"শ্রমজল নিবিড় পুরল সব অঙ্গ।
তৈখন রিরমল নয়ন তরঙ্গ॥
বিগলিত চিকুর, বাহু নহে বশ।
রতি শয়নে ধনি হোয়ল অলস॥"

নায়িকা কমললতার মধ্যে যে স্বরূপ উদ্‌ঘাটন হয়েছে তা নিয়ে আমি ব্যাপক আলোচনা করলাম বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে। এবং তার মধ্যে নায়িকার অষ্টাবস্থা প্রকাশ পেয়েছে।

"অভিসারিকা বাসকসজ্জা আর উৎকণ্ঠিতা,
খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা ও কলহান্তরিতা,
প্রোষিতভর্তৃকা আর স্বাধীন ভর্তৃকা।
এই অষ্ট অবস্থাতে রহয়ে নায়িকা॥"

এ-হেন নায়িকা কমললতা কার প্রেম-মুগ্ধা! শ্রীকান্তের, না, যুগলমূর্তির না গহর-কবির! আমরা আপাতঃদৃষ্টিতে দেখি—কমললতা একদিকে পরম বৈষ্ণবী গোঁসাইদের প্রতি অতি নিবিড় শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেম, আবার রাধামাধবের মূর্তির পরিচর্য্যাতে তার দক্ষতা দেখবার মত—প্রভাতে উঠে কুসুম চয়ণ থেকে শুরু করে ভোগারতি-সন্ধ্যারতি সবটাতে তাকে থাকতে হবে। আবার শ্রীকান্তের সেবাতেও ত্রুটি নেই—চা, আহার এমন কি মশারী টাঙ্গানোতে তার ভুল দেখি না। ওদিকে গহর-কবির প্রতি দরদও কম নেই। তা হলে কমললতার জীবন দর্শন কী? সে কি

লোক দেখানো উচ্চৈস্বরে কীর্তন গায়িকা না মৃদুস্বরে কীর্তন গুঞ্জনিকা!

এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের আরো গভীরে প্রবেশ করতে হচ্ছে। রাজলক্ষ্মীকে দেখার পর কমললতা বুঝতে পেরেছিল—সে শ্রীকান্তের চিত্তহরণ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয় নি। যে শ্রীকান্তকে সে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে অতি-আপনজন করে নিয়ে তার কাছে সুখ-দুঃখের কত অতীত গল্প বলেছিল—তা কি একেবারে উবে গেল কর্পূরের মত। কিন্তু তার কথাবার্ত্তায় সেটা তো তেমন করে প্রকাশ পায়নি—যা পেয়েছে রাজলক্ষ্মীর মধ্যে। কমললতা, রাজলক্ষ্মী এবং উভয়ের মাঝখানে শ্রীকান্ত—মনে হয় কমললতা চন্দ্রাবলী, শ্রীকান্ত বৃন্দাবন গোপীজনবল্লভ আর রাজলক্ষ্মী হল শ্রীমতী রাধা। রাজলক্ষ্মীর মধ্যে 'চাপল্য' প্রকাশ পেয়েছে ক্ষণে ক্ষণে। তার চিত্ত নারী চিত্ত—সেই চিত্ত যেন বারম্বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—

"গহন নিকুঞ্জ মাঝে ভেটিল নাগর রাজে, তুমি কে
আছহ বসিয়া।
সংকেত করেছে মোরে সে-হেন নাগরবরে
চন্দ্রাবলী মিলিবে আসিয়া॥

কিন্তু কমললতার মধ্যে তা দেখি না। মাৎসর্য বা Jealousy, অসহিষ্ণুতা বা Indignation due to intolerance বা গর্ব অর্থাৎ conceit, অহংকার—Pride, অভিমান—Vanity, দর্প—Elation, উদ্ধসিত—Taunt, মদ—Boast, ঔদ্ধত্য—Arrogance, শ্লেষ—Scoff, এ-সব প্রকাশ পায় নি। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর মধ্যে তা বেশ ভাল মতই প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু কমললতার হৃদয় কমলবনে শ্রীকান্তের আগমনে এক ভীষণ তুফান উঠেছে। এবং সে শ্রীকান্তের হাত ধরে সুদূর-পথযাত্রী হতে পারে। সে মনে মনে ভেবেছিল শ্রীকান্ত তার আপন

হৃদয়বাসী। কিন্তু রাজলক্ষ্মীকে দেখার পর তার মনের মধ্যে 'নির্বেদঃ আত্মধিক্কারঃ” হল বোধ হয়। সে তখন নতুন ভাবে আত্ম-বিশ্লেষণ করে 'নবপন্থা' গ্রহণ করল। তা পরবর্তী অধ্যায় বলছি।

তার আগে আমি ব্যভিচারীভাবের কিছুটা উদাহরণ দিচ্ছি। 'ব্যভিচারীভাব'—অমৃত সমুদ্রে তরঙ্গের মত স্থায়িভাব থেকে উৎপত্তি হয়। এই ভাব স্থায়িভাবের পুষ্টিসাধন ক'রে আবার তাতেই মিলিয়ে যায়। অর্থাৎ 'বিশেষণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িণং প্রতি। বাগঙ্গ সত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ।”

বিদ্যাপতি বলেছেন :—

“সুরতরু তল খব ছায়া ছোড়ল
হিমকর বরিখায় আগি।
দিনকর দিন ফলে শীত না বারল
হব জীয়ের কথি লাগি ॥”

গোবিন্দদাস লিখেছেন :—

“কি যে সুখ লাগি ভসম নহ দেহ।
অবমঝু জীবন উপেখন হোয় ॥”

জ্ঞানদাস গেয়েছেন :—

“বন্ধুরে কহিও মোর কথা।
অনলে পশিব যদি না আইসে এথা।
মরণ অধিক ভেল এ ছার জীবন।
পিয়া বিনু দগধয়ে যেন দাবে বন।”

তবু কমললতাকে বোঝা যাচ্ছে না। কমললতা যেন শরৎ-সাহিত্যকে সম্পূর্ণভাবে ব্যঙ্গ করবার জন্য আত্মপ্রকাশ করেছে স্ব-মহিমায়। আমার মনে হয় বোষ্টমী কমললতা যেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রায় রামানন্দের কাছ থেকে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন সেই পথের পথিক হতে চেয়েছে সে। যা শ্রীকান্তের কাছে ধরা পড়েনি।

রায় রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে যে ব্যাখ্যা করেন—তার প্রভাব শেষ কালে কমললতার মনে উদয় হয়েছিল।

"প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্বসাধ্যসার॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্যসার॥

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্বসাধ্যসার॥

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্য প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥

কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥

কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম্য॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেত বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
এই প্রেম-অনুরূপ না পাবে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে॥
যদ্যপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তার বাড়য়ে মাধুর্য্য॥

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধা-প্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥
প্রভু কহে আগে কহ শুনি পাইয়ে সুখে।
অপূর্ব্ব অমৃত-নদী বহে তোমার মুখে॥
চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥

রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ ॥
রায় কহে তবে শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে নাহি রাধা-প্রেমের উপমা ॥
গোপীগণের রাসনৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া ॥
শতকোটি গোপী-সঙ্গে রাসবিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধা-পাশ ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ॥
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি ॥
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥
তাহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করয়ে কাম-বাণে খিন্ন হৈয়া ॥
শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥
প্রভু কহে যে লাগি আইলাঙ তোমা স্থানে।
সেই সব রসবস্তুতত্ত্ব হৈল জ্ঞানে ॥
এবে জানিল সেব্য-সাধ্যের নির্ণয়।
আগে কিছু আমার শুনিতে চিত্ত হয় ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধিকা-স্বরূপ।
রস কোন তত্ত্ব প্রেম কোন তত্ত্বরূপ ॥

কৃপা করি এই তত্ত্ব কহত আমারে।
তোমা বিনে ইহা কেহ নিরূপিতে নারে॥
রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি।
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকের পাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট॥
হৃদয়ে প্রেরণা কর জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি॥
প্রভু কহে মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হৈল।
কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্বকথা তাঁহারে পুছিল॥
তেঁহো কহে আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে তেঁহো নাহি এথা॥
তোমার স্থানে আইলাঙ তোমার মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া॥
কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥
যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে।
তাঁর মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে॥
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল।
জানিতেঁহো রায়ের মন হৈল টলমল॥
রায় কহে আমি নট তুমি সূত্রধার।
যেমত নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবার॥

মোর জিহ্বা বীণা-যন্ত্র তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই তাহা উঠয়ে উচ্চারি॥
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্ব-কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরসপূর্ণ॥

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্ত-আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥

নানা ভক্তের নানামত রসামৃত হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥

শৃঙ্গাররসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥

আপন মাধুর্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥

সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ত্ব রূপ॥
কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে॥

সচ্চিৎ-আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম
আনন্দ চিন্ময়-রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী॥

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার॥
মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাতে অতিসুগন্ধি দেহ উজ্জ্বলবরণ॥
কারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃতধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি স্নান।
নিজলজ্জা-শ্যাম-পট্টশাটী পরিধান॥
কৃষ্ণ-অনুরাগে রক্ত দ্বিতীয় বসন।
প্রণয়-মানৎকঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী-প্রণয় চন্দন।
স্মিত-কান্তি কর্পূর তিনে অঙ্গ-বিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥
প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধর্ম্মিল্ল বিন্যাস।
ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পট্টবাস॥

রাগ-তাম্বুলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেম-কৌটিল্য নেত্র যুগলে কজ্জল॥
সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাবভূষণ প্রতি অঙ্গে ভরি॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত।
গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত॥
সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল॥
মধ্যবয়ঃস্থিতা সখী-স্কন্ধে কর-ন্যাস।
কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্ত সখী আশ-পাশ॥
নিজাঙ্গসৌরভালয়ে গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসিয়াছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ॥
কৃষ্ণ নাম গুণ যশ অবতংস কাণে।
কৃষ্ণ নাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় প্রেম রস মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম-রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর॥

যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঁই, কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যাঁর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥
প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণরাধা-প্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব॥

রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীরললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত॥

রাত্রিদিনে কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে।
কৈশোরবয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে॥

প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর।
রায় কহে ইহা বই বুদ্ধির গতি নাহি আর॥
যেবা প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥
এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেষল জনি॥
এ সখি সে সব প্রেমকহানী।
কানু-ঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুঁহুকেরী মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অব সেই বিরাগ তুঁহু ভেলি দোতী।
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধন-রুদ্র-নরাধিপ-মান।
রামানন্দরায় কবি ভাণ॥

শ্রীকান্তের সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর আগমন ও গহরের মৃত্যু—এবং মৃত্যুর পর আখড়ায় তাকে নিয়ে যে বিরূপ আলোচনা তাতে কমললতার মন মানুষের উপর বিরূপ হয়। সে তখন কৃষ্ণসান্নিধ্য পাবার প্রত্যাশা নিয়ে বৃন্দাবনের পথে পাড়ি জমায়।

কিন্তু এত করেও কমললতা পরম বৈষ্ণব হতে পারল কৈ? প্রকৃত বৈষ্ণবকে হতে হবে তৃণের চেয়ে নীচ, বৃক্ষের মত সহিষ্ণু। কিন্তু সে যখন গহর কবির ঘরে তিন রাত্রির কাটিয়ে মৃত্যুপথযাত্রীর সেবা-পরিচর্য্যা করে—এবং মৃত্যু পর্যন্ত থেকে আশ্রমে ফিরলো, তখন নবদ্বীপের প্রধান গোস্বামী আখড়ায়। তিনি মন্তব্য করলেন —কমললতা মন্দিরের যাবতীয় কাজ থেকে বঞ্চিতা হয়েছে। এতে কমললতার হৃদয় ভেঙ্গে পড়ে।

"অনতিবিলম্বে ঠাকুরের সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের শব্দ আসিয়া পৌঁছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, কই তুমি গেলে না?

না, আমার বারণ।

বারণ! তোমার? তার মানে?

কমললতা ম্লান হাসিয়া কহিল, বারণ মানে বারণ গোঁসাই। অর্থাৎ ঠাকুরঘরে যাওয়া আমার নিষেধ। আহারে রুচি চলিয়া গেল—বারণ করলে কে? বড়-গোঁসাইজীর গুরুদেব। আর তাঁর সঙ্গে এসেচেন যাঁরা—তাঁরা।

কি বলেন তাঁরা?

বলেন আমি অশুচি, আমার সেবায় ঠাকুর কলুষিত হল।

অশুচি তুমি? বিদ্যুদ্বেগে একটা কথা মনে জাগিল—সন্দেহ কি গহরকে নিয়ে?

হ্যাঁ তাই।

কিছুই জানি না, তবুও অসংশয়ে বলিয়া উঠিলাম, এ মিথ্যে —এ অসম্ভব!

অসম্ভব কেন গোঁসাই?

তা জানি না কমললতা, কিন্তু এত বড় মিথ্যে আর নেই।

মনে হয় মানুষের সমাজে এ-তোমার মৃত্যু-পথযাত্রী বন্ধুর ঐকান্তিক সেবার শেষ পুরস্কার।

তাহার চোখে জল ভরিয়া গেল, বলিল, আর আমার দুঃখ

নেই। ঠাকুর অন্তর্যামী, তাঁর কাছে ত ভয় ছিল না, ছিল শুধু তোমাকে। আজ আমি নির্ভয় হয়ে বাঁচলুম গোঁসাই।

সংসারে এত লোকের মাঝে তোমার ভয় ছিল শুধু আমাকে? আর কাউকে নয়?

না—আর কাউকে নয়। শুধু তোমাকে।”

এখানে বোষ্টমী কমললতার দ্বিমুখীন্ চরিত্র সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ পাষাণ ঠাকুর কথা না বললেও তিনি সবই বোঝেন। আর শ্রীকান্ত কথা বলে, উত্তর দেয়, প্রশ্ন করে। সেও কমললতাকে অবিশ্বাস করে না। কিন্তু যে বৈষ্ণব-প্রধানরা করেন—তারা কিন্তু কমললতাকে বৈষ্ণবী করতে পারল না। এবং কমললতাও প্রকৃত বৈষ্ণব-জগৎ থেকে বিচ্যুতা।

তবে কি সে সহজিয়া পন্থী?

ছয়

কমললতা কি মহাযানি

কমললতা কি বৈষ্ণব-ধর্ম-পথ ত্যাগী ?

সে কি সহজিয়া পন্থী ? এই নিয়ে একটা প্রশ্নের ঝড়ও উঠছে। বাসন্তী চৌধুরী তাঁর 'বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন, 'বৈষ্ণব শব্দটি আমরা সেই অর্থে প্রয়োগ করিয়াছি, যে অর্থে ডক্টর সুশীল কুমার দে তাঁহার Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal. গ্রন্থে এবং হরিদাস দাস বাবাজী তাঁহার গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ ও সহজিয়াদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করেন নাই। নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব গৃহস্থ ও অভ্যাগত বৈষ্ণবগণ সাধন-সঙ্গিনী হিসাবে যাঁহারা নারীকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া মানিতে রাজী নহেন।"

শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বে কমললতাকে কি আমরা কারুর সাধন-সঙ্গিনী রূপে দেখতে পাই নাকি? চেতন বা অবচেতন চিত্তে শ্রীকান্ত কি কমললতাকে নিয়ে পথে নামতে চেয়েছিল! না—কমললতাই শ্রীকান্তকে জীবন-সাথী করে পরমপদ পাবার প্রত্যাশা করেছিল। যতদূর বোঝা যায়—তাতে মনে হয় কমললতা 'সহজিয়া পন্থী" কিছুটা হতে চেয়েছে। তাহলে জানতে হবে 'সহজিয়া' কি? বৌদ্ধধর্মের যে দুইটি শ্রেণী আছে—হীনযান ও মহাযান—সহজিয়া এই মহাযান শ্রেণীর এক শাখা বিশেষ। যাঁরা সহজ-মতে সাধনার কথা বলেছেন—পরবর্তীকালে একটি ব্যাপক অর্থে তাঁরাই 'সহজিয়া সাধক' রূপে পরিচিত হন। পূর্বভারতের বাংলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা অঞ্চলে ও উত্তর নেপাল, ভুটান ও তিব্বত অঞ্চলে

সহজিয়া সাধন পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়ে। আমি এখানে 'সহজিয়া' সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি।

(১) সহজ শব্দের অর্থ হল যা সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়। কোন মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর অথবা জড় জিনিসের বাহিরের রূপের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গেই তার ভিতরে একটা শাশ্বত স্বরূপও জন্মলাভ করে। সেই শাশ্বত স্বরূপই হ'ল সহজ। সহজের উপলব্ধির মানে হ'ল নিজের ভেতরকার এই শাশ্বত স্বরূপের উপলব্ধি ও সেই আত্মস্বরূপ উপলব্ধির ভেতর দিয়া দৃশ্যমান যাবতীয় প্রাণী ও বস্তুসমূহের অন্তর্নিহিত শাশ্বত স্বরূপের উপলব্ধি···মানুষের স্বভাবকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করবার চেষ্টা না করে সেই স্বভাবের অনুকূল পথ অবলম্বন করে যোগপথে আত্মোপলব্ধির যে চেষ্টা তা হ'ল ধর্মের ক্ষেত্রে সহজ পথ।

(২) "মহাযান-বৌদ্ধধর্মের নানা শাখার মধ্যে একটি ছিল বজ্রযান-বৌদ্ধ ধর্ম। এই বজ্রযান হইতেই উদ্ভূত হইল সহজপন্থী মত, পরবর্তীকালে যাহার নাম হইয়াছে সহজযান। বজ্রযানের মধ্যে মন্ত্র-তন্ত্র, পূজা-অর্চনা, ব্রত-নিয়ম, শাস্ত্রবিধি ইত্যাদির যে প্রাবল্য দেখা দিল, সহজিয়াগণ আবার তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, মন্ত্র-তন্ত্র, ধ্যানব্যাখ্যান বৃথা, মহাসুখরূপ সহজের উপলব্ধিই হইল পরম নির্বাণ। সহজসাধক শান্তিবাদ বলিলেন. 'যাহারা যাহারা গেল এই ঋজু বা সরল পথে, তাহারাই হইল অনাবর্ত অর্থাৎ তাহাদিগকে আর জন্ম-মৃত্যুর আবর্তের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইবে না। সরহপাদ বলিলেন। ঋজুকে ছাড়িয়া কেহ বাঁকাকে লইও না, নিকটেই বোধি আছে। নিকটে নিজের দেহের মধ্যেই যে বোধি বা বুদ্ধ রহিয়াছে ইঁহার উপলব্ধিই সহজ-পথের কথা।" ভাব ও অভাব— ইহার কোনটাই সত্যি নয়, সত্যি শুধু দুর্লক্ষ্য বিজ্ঞান—যা সকল

অস্তিত্ব-প্রবাহের মধ্যেই শৃঙ্গার করছে—কিন্তু অদ্ভুত পরিকল্প বলে যা সম্পূর্ণ—অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌।

আগেই বলেছি সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মেরই এইটি শাখা। বৌদ্ধরা অর্থাৎ থেরাবাদী বৌদ্ধরা বলেন, "The Buddhist then, replaces Nemesis and Providence, Kismet Destiny and Fate, with a natural law, by his knowledge of which he moulds his future hour by hour. But even as the causes generated by one man react upon that man, so the mass causation of a group, be it family society or nation, reacts upon that group as such, and upon all whose karma placed them at the time therein."

কমললতার চরিত্রের মধ্যে কর্মবাদ—"It is the interdependence of Humanity which is the cause of what is called Distributive karma, and it is this law which affords the solution to the great question of collective suffering and relief."

সুফীদের মতই থেরাবাদী বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন জীবনটা রাজপথপার্শ্বে সরাইখানা—কত ঘটনার আনাগোনা—আবার পেছনের দুয়ার দিয়ে 'মৃত্যু'। মনে পড়ে অমর খৈয়ামের উক্তি :—

"জীর্ণ ভাঙ্গা সরাই খানারা রাত্রি-দিবা দুইটি দ্বার
তারই ভেতর আনাগোণা দুনিয়াদারী চমৎকার।
রাজার পড়ে আসছে রাজা সজ্জা কত বাদ্য ধুম্‌
এ-সব ক-দিনই বা তারপরেতে সব নিঝুম্‌॥"

কমললতার চরিত্রের প্রথম দিকটা যেন এই সত্যের দ্বারা অনুপ্রানিত হয়েছিল কিন্তু 'Esoteric tradition' দের মতই তার মনে হয়েছিল মানুষ নিঃসঙ্গ। সে একা এসে থাকে—একা যায়—এ-আসা যাবার ছেদ নেই।

মৃত্যুই তার বিশ্রামগৃহ। ইংরেজ কবি Charles Dolmon এর মতই কমললতা বলতে পারে :—

"Feathered birds, and fishes finned,
And clouds and rain and calm and wind,
And sun and moon and stars declare,
All life is one life, every where ;

That nothing dies to die for good
In clay or dust, in stone or wood,
But only rests awhile to keep
Life's ancient convenant with sleep,"

মহাযানী বৌদ্ধদের মতই এই সরলা নারী 'The transference of Merit' কে বিশ্বাস করেছে এবং জেনেছে 'A natural development of the doctrine of comparsion for all life is the transference or turning round of 'merit' from the actual earner to some particular or general beneficiary,"

আমরা আমাদের পথ থেকে একটু সরে যাচ্ছিলাম। আবার ফিরে আসি। কমললতা সহজিয়া হলেও বৈষ্ণব সহজিয়া নারী। তাই এই সহজিয়া সম্পর্কে শশিভূষণ দাশগুপ্ত কি বলেন তা দেখি :—

"বাংলদেশের বৈষ্ণবদিগের মধ্যে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে একটি বিশেষ সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধসহাজিয়াগণের ন্যায় ইঁহারাও সহজ-পন্থী ছিলেন; অর্থাৎ ইঁহাদের চরম উদ্দেশ্য ছিল মহাভাব-রূপ সহজ বস্তুকে লাভ করা, সাধন-পন্থাও ছিল সহজ বা অবক্র। নিজেদের সহজিয়া মত প্রচার করিবার জন্য ইহারা বাংলায় অনেক গান এবং পদ্যে-গদ্যে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। এই তত্ত্বগ্রন্থ ও গান লইয়াই বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্য। বহু প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাসই প্রথম

বৈষ্ণব সহজিয়া মতের সাধক এবং প্রচারক। তিনি রামী নাম্নী এক রজকিনীর সহিত এই সহজ-সাধনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ রাগাত্মিকা পদাবলীর ভিতর দিয়া তিনি এই সহজ-সাধনার গূঢ় তত্ত্বই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।…বৈষ্ণব-সহজিয়াদের নামে প্রচলিত রচনাবলীর মধ্যে 'বিবর্ত-বিলাস' 'আনন্দ-ভৈরব' 'অমৃত-রসাবলী, আগমগ্রন্থ, 'প্রেমবিলাস' রাধারস-কারিকা; 'দেহ-কড়চ,' তরুণী রমণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ-সহজিয়া সম্প্রদায়েরই মত বৈষ্ণব সহজিয়াগণ ও বলিয়াছেন যে প্রত্যেক নর-নারীর দৈহিক রূপের মধ্যেই তাহাদের স্বরূপ বা সহজরূপ লুক্কায়িত আছে। নররূপে নর, স্বরূপে কৃষ্ণ; তেমনিই নারীরূপে নারী, স্বরূপে রাধা। রূপ ছাড়িয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। রূপের মিলনে যখন স্বরূপের মিলন সংঘটিত হইবে তখনই আসিবে অনাবিল সাম-রস্যের অনুভূতি। বৈষ্ণব-সহজিয়াগণ কামকেই প্রেমে পরিণত করিতে চাহেন। এই জন্যে তাঁহারা যে সাধনা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা হইল আরোপ সাধনা; রূপে স্বরূপের আরোপ, নর-নারীতে কৃষ্ণ-রাধার আরোপ। এই আরোপ-সাধনার দ্বারা যখন স্বরূপে ধ্রুবা স্থিতি লাভ হয়, তখন নর-নারীর আকর্ষণে আর কাম থাকে না, তাহা প্রেমে পরিণত হয়। তবে এ সহজ-সাধনা বিশেষ সহজ নয়। সহজিয়াদের নিজের ভাষায় 'সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি'—তবেই সম্ভব হইবে এই সহজ-সাধনা। চণ্ডীদাস ও বলিয়াছেন, প্রকৃত সহজ সাধক 'কোটিতে গোটিক হয়।'

অতএব এবার আমি কমললতার অনেক নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছি। কারণ এখন কিছুতেই অস্বীকার করা চলবে না যে সে বৈষ্ণব-সহজিয়া পন্থীদেরই পথ অনুসরণ করেছে। বৈষ্ণবী কমললতা শ্রীকান্তকে যে দুটি পদ শোনায় তার মধ্যে সেই সত্য প্রকাশ পেয়েছে।

কমললতা গাইল,

"কহে চণ্ডিদাস শুন বিনোদিনী সুখ দুখ দুটি ভাই—
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তারই ঠাঁই।"

আবার সে গায় :—

"চণ্ডিদাস বাণী শুন বিনোদিনী পীরিতি না কহে কথা,
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পীরিতি মিলায় তথা।"

কমললতার কথাবার্তা এবং চিন্তায় চণ্ডীদাসের জীবন দর্শন ফুটে উঠেছে। চণ্ডীদাস বৈষ্ণব সহজিয়া ছিলেন। তাঁর সাধন-সঙ্গিনী রজকিনী রামী। হিন্দু-তন্ত্রানুসারে সাধন-সঙ্গিনীর প্রয়োজন :— কুমারী তন্ত্রে দেখি :—

"নটীকাপালিকা বেশ্যা পুক্কশী নাপিতাঙ্গনা।
রজকী রঞ্জকী চৈব-সৈরিন্ধ্রী চ সবাসিনী"॥
বিশেষ বৈদগ্ধ্যযুতা সর্বা এব কুলাঙ্গনা।"

আবার বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনেও সাধন-সঙ্গিনীর প্রয়োজন হয়।

"পরকীয়া রতি যাহারে কহয়ে
সেই সে আরোপ সার।
তোমার আরোপ রজক ঝিয়ারী
রামিনী নাম যাহার॥
যাহা কহি বাণী শুনহ রামিণী
একথা ভুবন পার।
পরকীয়া রতি করহ আরতি
সেই সে ভজন সার॥
চণ্ডীদাস নামে আছে একজন
তাহারে আরোপ কর।
অবশ্য করিলে নিত্যধামে যাবে
আমার বচন ধর॥"

বৌদ্ধ সহজিয়াদের ও সাধন-সঙ্গিনী প্রয়োজন।

যথা ঃ— 'নবযৌবনসম্পন্নাং প্রাপ্য মুদ্রাং সুলোচনাম্।
স্রক্‌চন্দন্‌সুবস্ত্রাদ্যৈর্ভূষয়িত্বা নিবেদয়েৎ॥
গন্ধমাল্যাদিমৎকারৈঃ ক্ষীরপূজাদিবিস্তরৈঃ।
ভক্ত্যা সম্পূজ্য যত্নেন মুদ্রয়া সহ নায়কম্॥"

কিন্তু মুরারীপুর আখড়ায় বোষ্টমী কমললতা কার সাধন-সঙ্গিনী? বা তার সাধন-সঙ্গী কে? যার দ্বারা সে 'পুরুষ প্রকৃতি, দোঁহে এক রীতি, সে রতি সাধিতে হয়—বলবে ও মনে মনে ধ্যান করবে 'পুরুষেরি যুতে, নায়িকার রীতে, যেমতে সংযোগ প্রায়।' হয়তো কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করবেন—কবি গহর তার নিভৃত-সাধন সঙ্গী ছিল। কিন্তু তার কোন প্রকাশ্য প্রমাণ পাই না। তবে শ্রীকান্তকে 'আশ্রয় লইলে সিদ্ধ রতি মিলে কখন বিফল নয়' তা উপলব্ধি করেছিল কমললতা। কমললতা শ্রীকান্তকে সঙ্গে নিয়ে আখড়ায় বা পথে বসবাস করলে মহাভারত অশুদ্ধ হত না। কারণ প্রকৃতি-পুরুষ-মিলন ঘটিত সাধনার সমর্থকেরা সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীদের প্রকৃতির কথা বলেছেন—যথা ঃ—

"শ্রীরূপ করিলা সাধনা মীরার সহিতে।
ভট্ট রঘুনাথ কৈলা করণ যাই সাথে॥
লক্ষহীরা সনে করিলা গোস্বামী সনাতন।
মহামন্ত্র প্রেমসেবা সদা আচরণ॥
গোঁসাই লোকনাথ চণ্ডালিনী কন্যা সঙ্গে।
দোঁহা ভাসে অনুরাগে প্রেমের তরঙ্গে॥
গোয়ালিনী পিঙ্গলা সে ব্রজদেবী সমা।
গোঁসাই কৃষ্ণদাস সদাই আচরণা॥
শ্যামা নাপিতানির সঙ্গে শ্রীজীব গোঁসাই।
পরম সে ভাব কহিতে যার সীমা নাই॥

রঘুনাথ গোস্বামী প্রীতি উল্লসে।
মীরাবাঈ সঙ্গে তেঁহ রাধাকুণ্ড বৈসে॥
গৌরপ্রিয়া সঙ্গে গোপাল ভট্ট গোঁসাই।
করয়ে সাধন অন্য কিছু নয়॥
রায় রামানন্দ যজ্ঞে দেবকন্যা সঙ্গে।
আরোপেতে স্থিতি তেই ক্রিয়ার তরঙ্গে॥"

এত আলোচনা করেও কমললতাকে পূর্ণ ভাবে স্বীকার করতে পারছি না সে হল বৈষ্ণব-সহজিয়া। উপরন্তু মনে হয় কমললতা মরমীয়া নারী—সূফী গোত্রীয়া কামিনী।

সাত

সূফীবাদ ও কমললতা

পারস্যের সূফী কবি সাদীর কাব্য ললিকা যেন কমললতার হৃদয়ের ভেতর অঙ্কুরিত হয়েছে—শ্রীকান্তের আগমণ মুহূর্তে। এবং তা শরৎ উষার তরুণ তপণের মতো উদ্ভাসিত হয়েছে শেষ অধ্যায়। আমরা ধীরে ধীরে সে-দিকে অগ্রসর হব। কমললতা যেন জীবন-দেবতার সন্ধান লাভ করেছে—কবি সাদীর মত—সে যেন বুঝেছে ঃ—উঁচু গিরিচূড়ায় এক মন্দির চিনি। অতি মন্থর বায়ু সেখানে যেতে শঙ্কিত হয়। গগন-বিদ্যুৎ সেই মন্দির থেকে আমার প্রিয়তমের সংবাদ আনবে। সে-চূড়োর সমতলে আমার পরাণপুতল আমার প্রাণনাথ থাকে। হে বিহঙ্গ-আমার সংবাদ সেখানে নিয়ে যাও। যদি রবির-কিরণও তার সৌন্দর্যে স্তিমিত। যদি সে কৃপা-কণ্ঠে প্রশ্ন করে—তাহলে উত্তর দিও, পরাণ দিয়া আমি তার করুণা প্রার্থনা করি। বল—হে-সুন্দর—তুমি আছ আবার নাই। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে দিবসরজনী তার মধুর স্মৃতি আমার হৃদয় সরণীতে যাতায়াত করছে। তোমায় দেখতে পাচ্ছি না বলে এ-দুঃখ রাখবার স্থান নেই! তুমি কৃপা না করলে আমার এমন কি ক্ষমতা যে তোমায় দেখব? তোমার কৃপাহীনতার অগ্নিতে আমার পথ রুদ্ধ হয়। মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত প্রাণ। আমি তোমার স্বপ্ন দেখি—শুধু তোমারই।

কমললতার মধ্যে এই ভাবটি যথার্থ রূপে প্রকাশ পেয়েছে। তার পরাণ পুতুলী আছে বৃন্দাবনে—বৃন্দাবনের পথ তার মুক্তির পথ। সে পথে সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে যেতে প্রস্তুত। কারণ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্রহরণ করে কদম্ব শাখে উঠে বলেছিলেন, তোমরা যদি

আমার প্রকৃত দাসী হয়ে থাকো—তা হলে ঐ নগ্ন তনু নিয়ে উপস্থিত হও আমার কাছে।' কমললতা বুঝি তাই চলেছে বৃন্দাবনের পথে। কিন্তু যাওয়া বললে তো যাওয়া চলে না। কী পথে চলছে তা দেখতে হবে। সূফী ভাবে ভাবাপন্ন হয়ে সে চলেছে অজানা ভবিষ্যতের দিকে।

শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী যখন হতে চেয়েছে সংসারী, কমললতা এক নামহারা নায়িকা হয়েও তার বসন্তরাতকে উত্তপ্ত-যৌবনমোহ রক্তকামনায় রঞ্জিত করতে চায় নি সামান চিরনতুন বিবাহ মিলনের মধ্যে দিয়ে। তার চৈত্রসন্ধ্যাকাশতুল্য জীবন যৌবনকে সযত্ন-সেচনসিক্ত নবোন্মুখ গোলাপের মতই অর্ঘ্য দিতে চলেছে—পরমপুরুষের কাছে। শ্রীকান্ত শুনেছিল এই তরুণী পূর্ব-ইতিহাস—এবং আখড়ার নির্জ্জনতার মাঝে পুরুষ শ্রীকান্ত রজনীগন্ধার মত আগ্রহে উৎসুক উন্নমিতা কমললতার কণ্ঠে 'কণ্ঠে কণ্ঠে থাকি' সে 'শুনেছিল দুটি বক্ষোমাঝে বাসনা বাঁশরি। সে ভেবেছিল এই বোষ্টমীর ব্যর্থ জীবনের সেই কয়খানি পরম অধ্যায়হীন রাজ্যে সে হবে মধুমাস। কারণ এই কম্পিতাকুণ্ঠিতা নারীর অধরে লেখা আছে কত অগণ্য চুম্বণ ইতিহাস। কিন্তু সেটা সবই ভ্রান্ত।

এবং শুধুমাত্র মুরারীপুর বৈষ্ণব আখড়া থেকে নয়—সাঁইথিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে এই নারী যখন শ্রীকান্তের কাছ থেকে বিদায় নিল—তখন মানবতাবাদী শ্রীকান্ত নিশ্চিতভাবে ভেবেছিল :—

"ক্ষমা করো, ধৈর্য্য ধরো হউক সুন্দর তর
বিদায়ের ক্ষণ।
মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়, নহে বিচ্ছেদের ভয়
শুধু সমাপন—
শুধু সুখ হতে স্মৃতি, শুধু ব্যথা হতে গীতি,
তরী হতে তীর,

খেলা হতে খেলাশ্রান্তি বাসনা হইতে শান্তি
নভ হতে নীড় ॥

মরমীয়াই বলি আর সূফিই বলি—কমললতার মধ্যে শঙ্কাতরাস লজ্জাশরম স্তুতিনিন্দা পরিহার করে অগ্রসর হচ্ছে—এখানে সে সূফী সমগোত্রই।

শ্রীকান্ত যখন সুফীবাদী ছিল—তার চেয়ে বেশী কমললতার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। প্রাতঃস্মরণীয়া সুফী রাবিয়ার মতই যেন কমললতা তার এক নতুন জগৎ-সৃষ্টি করেছে। দরিদ্রা ক্রীতদাসী হয়েও রাবিয়া প্রকৃত-ঈশ্বর-প্রেমিকা ছিলেন। তাঁর প্রার্থনা বা 'মোনাজাত' শুনলে অতি বড় বৈদান্তিকও চমকে উঠবেন।

"হে প্রভু, যদি আমি কেবল নরক যন্ত্রণা হতে রক্ষা পাবার জন্য তোমার পূজা করি—তা হলে আমি যেন নরকেই জ্বলে-পুড়ে মরি। যদি আমি কেবল স্বর্গ প্রাপ্তির লোভে তোমাকে ডাকি—তা হলে স্বর্গে আমাকে নিও না। কিন্তু যদি আমি কেবল তোমার জন্যই তোমার সাধনা করি তা হলে আমার কাছে তোমার চিরন্তু শাশ্বত সৌন্দর্য প্রকাশ কর। আমার নরকের ভীতি নেই। স্বর্গে যাবার আনন্দ নেই। আমি নবীকেও ভালবাসতে পারি না কারণ তোমার প্রেমে আমার অন্তর পূর্ণ—এই হৃদয়ে আর কারুর উপর ভালবাসা বা ঘৃণার স্থান নেই।"

এইবার দেখুন—

কমললতার শেষ অধ্যায়গুলির চিত্র। ভাব তন্ময়তায় সে ডুবে আছে। তার মন পড়ে আছে সেই মধুর বৃন্দাবনের দিকে।

রাবীয়ার কাল থেকে নব-সুফী-যুগের উদয় সূর্যের আভা বিচ্ছুরিত হ'ল। অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী থেকে। এই নব সুফীবাদ ইসলাম-আদর্শ থেকে অনেকটা সরে এসে তার মধ্যে ভারতীয় বেদান্ত, বৌদ্ধ দর্শন, নিওপ্লেটোনিক দর্শন, খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসবাদ

অতীন্দ্রিয়বাদ, নাষ্টিক মতবাদ। পারশিক ভাব ধারা প্রতিফলিত হতে থাকে।

সুফীবাদের মধ্যে যে সব-প্রধান বস্তুটি আমাদের চোখে পড়ে তা হ'ল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বরই একমাত্র সত্য। এবং তিনিই একমাত্র প্রেমময়। আমরা সবাই প্রেমিকা—তিনিই প্রেমিক। এই প্রেমের আনন্দে সাধক ব্যক্তিগত মানবীয় সত্তার বিলোপ করে ভগবৎ-সত্তায় মিশে যেতে পারে। 'ইহা নিঃসন্দেহে ইসলাম-বহির্ভূত মতবাদ।' মিশর দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত ও মরমিয়া সাধু ধূ-ল্-নূন মিশ্‌রী হুজিয়িরির, ফরিদুদ্দিন্, রুমী, হল্লাজ, অল্-গাজানীর, সাদী, হাফিজ, প্রভৃতি সুফী কবি ও সাধকদের জীবন ধারার সঙ্গে কমললতার বেশ মিল দেখি।

রুমীর কবিতায় দেখি—

"দেখ, আমি আমার নিজের স্বরূপ জানি না, কি করব আমি? আমি খ্রীষ্টান নই, ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী নই, নাস্তিকও নই, ইহুদীও নই। পূর্ব-পশ্চিম স্থল-জল কোন স্থানেই আমার বাস নেই। দেবদূত বা অপদেবতার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নেই। ফেনা বা অগ্নি থেকে আমি সৃষ্ট নই। ধুম বা শিশির দ্বারাও নই। আমি ইহলোক, পরলোক-স্বর্গ-মর্ত-পাতাল কোথাও বাস করি না। আমি আদমের বংশজাত নই। সকল স্থানের উর্দ্ধে, চিহ্ন ও উদ্দেশবিহীন দেশে, দেহ ও আত্মাকে অতিক্রম করে আমি আবার বন্ধুর বুকে চির নবীন বেশে বাস করি।"

রুমী আবার বলেছেন—"পৃথিবীতে একমাত্র প্রেমিক যদি কেউ থাকে—তা হ'ল আমি। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, খৃষ্ঠ. ধর্মাবলম্বী, সাধু যদি কেহ থাকে তবে সে আমি। মদ্য-পান পাত্র বাহক, গায়ক, বীণা, দীপ, প্রিয়া, মদ্য, আনন্দ—সবই আমি—মৃত্তিকা বায়ু, জল, অগ্নি, দেহ, আত্মা-সকলই আমি। আমি চোরের চৌর্য, রোগীর রোগ—।"

রুমীর 'The Marriage of True minds' কমললতার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে। "Happy the moment when we are seated in the palace thou and I.

With two forms, and with two figures but with one soul, thou and I."

কমললতাও যেন 'তোমার মাঝে আমার প্রকাশ' তাই এত মধুর!' মুরারীপুর বৈষ্ণব-আখড়ায়—

"হে মোর অতিথি যত! তোমরা এসেছ এ জীবনে
কেহ প্রাতে, কেহ রাতে, বসন্তে, শ্রাবণ বরিষণে।
কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ বা কম্পিত দীপশিখা
এনেছিলে মোর ঘরে; দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা
বার বার এনেছ প্রাঙ্গণে। যখন গিয়েছ চলে
দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে।
আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম;
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম।

কিন্তু এই Mystic নারী শ্রীকান্তকে কি মন থেকে মুছে ফেলে বৃন্দাবনের পথে পাড়ি দিতে পারল? কত যে প্রাতের আশা, রাতের গীতি, কত যে সুখের স্মৃতি ও দুখের প্রীতি দিয়ে ঘেরা কমললতার শ্রীকান্ত—তা সবই ভুল!

শ্রীকান্ত দেখে উষা মুহূর্ত থেকে কমললতা অদৃশ্য। এবং "সমস্ত পথ চোখ যাহাকে অন্ধকারেও খুঁজিতেছিল, তাহার দেখা পাইলাম রেলওয়ে ষ্টেশনে। কমললতা শ্রীকান্তের কাছ থেকে কিছুই চায়নি। শুধু সর্ট জর্নির একটা টিকিট। কিন্তু যাবে বৃন্দাবনে সে—তবু শ্রীকান্তের ঋণের বোঝা আর বৃদ্ধি করতে চায় না। অবশেষে বৃন্দাবনের টিকিট কিনে দিল শ্রীকান্ত। দু'জনে একই সঙ্গে ট্রেনে চড়ল। শ্রীকান্ত তার শোবার জন্য বিছানা পেতে দিল।

"কমললতা ব্যস্ত হইয়া উঠিল—ও কি করচ গোঁসাই?

করচি যা কখনো কারো জন্য করিনি—চিরদিন মনে থাকবে বলে।

সত্যিই কি মনে রাখতে চাও?

সত্যি মনে রাখতে চাই কমললতা। তুমি ছাড়া যে কথা আর কেউ জানবে না।

কিন্তু আমার যে অপরাধ হবে, গোঁসাই?

না, অপরাধ হবে না—তুমি স্বচ্ছন্দে ব'সো।

রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে গাড়ি ছুটছে। মূক কমললতার দিকে তাকিয়ে শ্রীকান্ত ভাবে সে শ্রান্তি ক্লান্তিতে তন্দ্রাচ্ছন্না বুঝি। কিন্তু সাঁইথিয়া ষ্টেশনের সেই শ্রীকান্তকে ডেকে বলল, ওঠ, তোমার সাঁইথিয়ায় গাড়ী দাঁড়িয়েছে। শ্রীকান্ত দেখে-তার প্রদত্ত সামান্য বিছানাও গুটিয়ে তার জিনিস পত্তরের কাছে রেখেছে। অর্থাৎ ওটাও তার কাছে বোঝা। অবশ্য শ্রীকান্তের কাতর চোখের দিকে চেয়ে সে তা গ্রহণ করল, শ্রীকান্তের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

এইবার দেখুন—শরৎচন্দ্রের লেখনী প্রকাশ করছে কমললতা সুফী কিনা!

"বাঁশী বাজাইয়া সবুজ আলোর লণ্ঠন নাড়িয়া গার্ডসাহেব যাত্রার সঙ্কেত করিল। কমললতা জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া এই প্রথম আমার হাত ধরিল, কণ্ঠে কি যে মিনতির সুর তাহা বুঝাইব কি করিয়া, বলিল, তোমার কাছে কখনো কিছু চাইনি—আজ একটি কথা রাখবে?

হ্যাঁ রাখব, বলিয়া চাহিয়া রহিলাম।

বলিতে তাহার এক মুহূর্ত্ত বাধিল, তারপর কহিল, আমি জানি, আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও—নির্ভয় হও। আমার জন্য ভেবে ভেবে আর তুমি মন খারাপ ক'রো না গোঁসাই, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা।"

যেদিন শ্রীকান্তের আগমনে কমললতার শূণ্য মরুময় সিন্ধু-বেলাতে বন্যা রুদ্র নৃত্য শুরু করল, সেদিনও সে কি বালকালীন ফেন তরঙ্গ ক্রীড়ায় নিজেকে একাকিনীই ভেবেছিল? কারণ তার জীবন-বোধ এক অসীমত্বের দিকে ধাবিত হয়। যখন শ্রীকান্ত ভেবেছে—

"আজিকে তুমি ঘুমাও— আমি জাগিয়া রব দুয়ারে,
রাখিব জ্বালি আলো।
তুমি তো ভালো বেসেছ, আজি একাকী শুধু আমারে
বাসিতে হবে ভালো।
আমার লাগি তোমারে আর হবে না কভু সাজিতে—
তোমার লাগি আমি
এখন হতে হৃদয়খানি সাজায়ে ফুল রাজিতে
রাখিব দিনযামী॥"

আর কমললতা জানতে পেরেছে—সম্মুখে অনন্তলোক সেখানে যেতে হবে।

